পয়সা দিয়ে কেনা

আশাপূর্ণা দেবী

অরুলিপি ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী—১৯৬২

প্রকাশক :
ধীরা চৌধুরী
স্বরলিপি
২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌরাচাঁদ চৌধুরী

মুদ্রক :
তারারাণী রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৭, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৮

আদরের নাতনী মঞ্জীরকে

ভালবাসার সঙ্গে

দিদা

পয়সা দিয়ে তুমি দারিদ্র্য কিনলে !

পয়সা দিয়ে তুমি দারিদ্র্য কিনলে !

পয়সা দিয়ে তুমি—

সকাল থেকে সারাদিন হৃৎপিণ্ডের ওপর দমাস দমাস করে পড়ে চলেছে এই শব্দের হাতুড়ি।·····এই হাতুড়ির আওয়াজ যেন শহরের সমস্ত কোলাহলের খাঁজে খাঁজেও উচ্চকিত হয়ে উঠছে। চলন্ত বাসের চাকার ঘর্ঘরের মধ্যে বারংবার ধ্বনিত হচ্ছে।

ওই তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যটুকু এখন আর সুরমার কণ্ঠনিঃসৃত শ্লেষবাক্য বলে মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে না পীযূষকান্তি নামের লোকটার। এখন যেন তার নিজেরই চেতনার স্তরে স্তরে অবিরত ওই শব্দটা নিয়ে তীব্র গুঞ্জন তুলে চলেছে একটা কানা ভিমরুল।

পয়সা দিয়ে তুমি দারিদ্র্য কিনলে !

কানা ভিমরুল, না ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ড !

সুরমার অসন্তোষ আর ব্যঙ্গ অবশ্য এখন প্রতিপদেই ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। আর বাড়িতে পীযূষকান্তির দুর্মতি নিয়ে সমালোচনার এবং মন্তব্যের চাষ চলছে, তবু এর আগে কোনোদিন এমন অস্পষ্টতাহীন তীক্ষ্ণ মন্তব্য শোনা যায়নি সুরমার মুখে।

সকালবেলা বেরোবার মুখে, কথাটাকে যেন ছুঁড়ে মারল সুরমা পীযূষকান্তির গায়ের ওপর। পীযূষকান্তি চমকে উঠেছিল, আর বোধহয় অজ্ঞাতসারেই বলে ফেলেছিল, পয়সা দিয়ে কী কিনলাম ?

সুরমা আর দু'বার ব্যাখ্যা করেনি, শুধু সংক্ষেপে বলেছিল, যা কিনেছ তা নিজেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ। পয়সা দিয়ে তুমি—

হঠাৎ কথার ছেদ দিয়ে পীযূষের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল সুরমা। এটা সুরমার চিরকালের অভ্যাস, বেশী উত্তাল হলে কথা শেষ করতে পারে না।

পীযূষের আর তখন দাঁড়াবার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সুরমার ওই কথাটা তাকে সারাদিন তাড়া করে ফিরছে, কিছুতেই সরাতে পারছে না সেটাকে।

কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে কথাটা বলেছিল সুরমা ?

পীযূষকান্তি যখন বাজারের থলিটা নামিয়ে দিয়েছিল সুরমার সামনে ? গুলি গুলি আলু, ক্ষুদে ক্ষুদে পটল আর চারাপোনা মাছ সমেত ? না কি পীযূষের গেঞ্জির পিঠের ঘুলঘুলিগুলো দেখে যখন সুরমা বলে উঠেছিল, বাঃ !

কিন্তু সে তো অনেক আগে।

অফিস বেরোবার সময় তো না।

সে তো পীযূষ সামলে নিয়েছিল এ পাড়ার বাজারের নিন্দে করে। বলেছিল, ভেবেছিলাম আর কিছু না হোক অন্ততঃ বাজার টাজারগুলো ফ্রেশ পাওয়া যাবে এদিকটায় ! ধ্যুৎ ! বাজে বাজার।

সুরমা উদাসীন গাম্ভীর্যে বলেছিল, যখন হাতের মধ্যে একটা সেরা বাজার ছিল, তখন কোনোদিন বাজারের ছায়া মাড়াওনি, এখন এই পচা পাড়ার বাজে বাজারের কানা বেগুন আর পচা পুঁটি খুঁজে বেড়াচ্ছ।

সুরমার ওই 'পচা পুঁটি খুঁজে বেড়ানো'র অভিযোগটি গায়ের জ্বালাপ্রসূত হলেও, তার আগের কথাটি কিন্তু নিছক সত্যি ! 'গড়িয়াহাট বাজার' হেন বাজারের একেবারে গায়ের কাছে বাস করলেও পীযূষকান্তি কোনোদিন তার ছায়া মাড়াতে যায় নি।

শ্যামবাজারের পাড়া থেকে অনেকখানি দৌড় মেরে এ পাড়ায় এসেই পীযূষকান্তি প্রথম দিনই নতুন পাড়ার বাজার দেখতে বেরিয়েই

ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, সর্বনাশ! কে ঢুকবে বাজারে? বাজারের মধ্যে চোখের সামনে শুধু শাড়ির আঁচল।

শাড়ির আঁচল মানে? মাছ তরকারির বাজারে শাড়ির দোকান?

বলে উঠেছিল ছেলে টুটু।

দোকান? তা তাও বলতে পারিস। তবে চলন্ত দোকান। নেমন্তন্ন বাড়ি যাবার মতো জমকালো জমকালো সব শাড়ি পরে মহিলাবাহিনী শৌখিন শৌখিন ব্যাগ থলে সাজি চুপড়ি ইত্যাদি নিয়ে বাজার তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন।

তাতে তোমার কী?

সুরমা বলেছিল, তুমিও টেরিকট্ টেরিলিন স্যুট পরে রঙিন থলে হাতে নিয়ে বাজার চষে বেড়াওগে।

নাঃ। ও আমার দ্বারা হবে না।

পীযূষকান্তি বলেছিল, এ পাড়ায় উঠে এসে সংসারের সব থেকে ভারী কাজটাই তোমার ঘাড়ে পড়ল দেখা যাচ্ছে।

তার মানে আমিই যাব বাজার করতে?

তাইতো দাঁড়াচ্ছে।···পীযূষকান্তি উত্তর দিয়েছিল, তোমার কি দু'চারটে ওরকম জমকালো আঁচলাদার শাড়ি নেই?

সুরমা বলেছিল, সাউথে তো কবে থেকেই মেয়েরা বাজার দোকান করে, তোমাদের ওই নর্থের পাড়া এখনো পুরনো খুঁটি ধরে বসে আছে।···একদিনের কথা যদি শুনতে—তোমাদের ওখানকার পাশের বাড়ির মাসীমা? দক্ষিণ পাড়ার মেয়েদের নিয়ে কী ব্যাখ্যান। বলেন কিনা, বাড়ির বৌ ঝি কিনা ঝি চাকরাণীর মতো থলে হাতে বাজারে যায়, শাক পাতা মাছ মাংস আলু পটল কিনতে! কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! আধুনিক জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে তোমাদের ওই শ্যামবাজার পাড়ার এখনো বহুৎ দেরী!

গড়িয়াহাটে গিয়ে থেকেই সুরমা শ্যামবাজার পাড়াটাকে

'তোমাদের' বলতে শুরু করেছিল। পীযূষ সেটাকে ধর্তব্য করেনি। পয়লা রাত্তিরে বেড়াল কাটার গল্পটা পীযূষের জানা ছিল না মনে হয়।

উদোমাদা পীযূষকান্তির অবশ্য অমন অনেক কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু সুরমার জানা ছিল নৌকো নিয়ে ভাসতে হলে প্রথম কাজই হচ্ছে নোঙরের দড়িটা কেটে ফেলা।

সে থাক—পীযূষকান্তির প্রস্তাবটা সুরমা লুফে নিয়েছিল। 'সংসারের সবচেয়ে ভারী কাজটা'র ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে। অবিশ্যি একা যাওয়ার অভ্যাসটা রপ্ত করতে সময় লেগেছে। দামী দামী আঁচলাদার শাড়ি ঘুরিয়ে পরে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বেরোতে শুরু করেছিল।

আর পীযূষকান্তি ভাবতে শুরু করেছিল বাঁচা গেছে বাবা!

তদবধি ওই বেঁচে যাওয়া অবস্থাটাই চলেছে, কিন্তু আবার যেই পাড়া পাল্টে বসল পীযূষকান্তি, সেই পালা বদল হয়ে গেল।

এ পাড়ার ওই নোংরা গাঁইয়া দিনহীন বাজারে কে যেতে যাবে পীযূষকান্তি ছাড়া? সুরমা? তার মেয়েরা অথবা ছেলে? তাদের তো কন্যা দায় পড়েনি।....

পীযূষকান্তির অত সকাল সকাল বাজারে যেতে অসুবিধা হয়? হলে উপায় কী? খাল কেটে কুমীর নিয়ে এলে কুমীরের কামড়ও খেতে হবে বৈকি।

কিন্তু মুস্কিল এই—এখানের বাজারটা সত্যিই ততটা দীনহীন নয়, যতটা দীনহীন এখন পীযূষকান্তির পকেটটা। যে পীযূষকান্তি আগে শুধুশুধুই পকেটে নোটের গোছা না থাকলে মনে সুখ পেত না, সেই পীযূষকান্তি এখন গুনে গুণে শুধু বাজেট মতো টাকাটুকুই মাত্র সঙ্গে নিয়ে বাজারে যায়, পাছে বেশী খরচা হয়ে যায়।...এ শিক্ষাটি পীযূষকান্তির বর্তমানের গুরুদেবের।

তা সেই গুরু নির্দেশিত পন্থায় চালিত ব্যক্তির আহরিত সওদা

স্ত্রী কন্যার দেখে আহ্লাদিত হবার কথা নয়। অবশ্যই আক্রমণাত্মক হবার কথা।

কিন্তু সরাসরি আক্রমণে আত্মরক্ষার্থে পীযূষ বলে উঠেছে, খুঁজে বেড়াই মানে? এখানে তো দেখি বাজারের এই অবস্থা।

বলেছিল, তবে গলাটা বড়োই দুর্বল শুনিয়েছিল।

সুরমা বাঁকা একটু হেসে সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'এখানে' আসা সম্পর্কে একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে থলিটা উঠিয়ে নিয়েই চলে গিয়েছিল।

পীযূষকান্তিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল, অন্ততঃ তখনকার মতো ঝড় থামল ভেবে। কিন্তু তারপর?

তারপর?

ঠিক অফিস বেরোবার সময়?

হ্যাঁ, ঠিক বেরোবার মুখেই সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল। বুলু বলেছিল, তার একটা ইকনমিক্সের বইয়ের দরকার। দরকার মানেই 'অবশ্য' এবং 'আশু' প্রয়োজন। ওদের 'দরকারটা' একদিনও অপেক্ষা করতে জানে না। অতএব বাবা যেন গোটা চল্লিশ টাকা বুলুকে দিয়ে যায় বেরোবার আগে। সেটা শুনে পীযূষকান্তি হঠাৎ বলে ফেলেছিল, নাঃ তোমাদের পড়ার খরচাতেই ফতুর হতে হবে। এই না সেদিন আটাশ টাকা দিয়ে একটা বই কিনলে? একে তো যা মাইনে কলেজের আর বাস ভাড়ার বহর—

বুলু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সহসা একটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে ঝটকা মেরে চলে গিয়েছিল। শুধু যাবার সময় বলে গিয়েছিল, ঠিক আছে, সামনের মাস থেকে আর আমার পড়ার জন্যে খরচ করতে হবে না তোমাকে। তবে বাস ভাড়াটার খোঁটা দেবার আগে একটু ভেবে কথা বললে ভালো হ'ত।

বুলু, মানে পীযূষকান্তির ছোট মেয়ে, যে নাকি এই কিছুদিন গড়িয়াহাটের সেই বাড়িত 'বাপী' বলে বাপের গলা ধরে ঝুলে পড়ে

বলেছে, বাপী গো বাপী, তুমি কি সুইট। কারুর বাপী এমন নয়। ভীষণ মিষ্টি তুমি।

হঠাৎ পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটা তার ছেলেমেয়েদের কাছে সব মিষ্টত্ব হারাল কী বাবদ? যে বাবদই হোক হারিয়েছে যে তার প্রমাণ হঠাৎ হঠাৎই পেয়ে যাচ্ছে সে, এখন আরও একবার প্রত্যক্ষভাবে পেল।

তবু পীযূষকান্তি মেয়ের ওই তীব্রতাটিকে হালকা করে দেবার চেষ্টায়, (যে চেষ্টা সব সময় করে 'অমৃতং বালভাষিতং' হিসেবে ধরে) বলে উঠল, আমার আর খরচা দিতে হবে না? বলিস কি? হঠাৎ একখানা শাহানশা শ্বশুর-টশুর বাগিয়ে বসেছিস নাকি?

মেয়ে সে কথায় কথায় কান দিল না, চলে গেল। শুধু সুরমা বলে উঠল, থাম তো। সব সময় আর সাপের লেজে পা দিতে যেও না।

পীযূষকান্তি লক্ষ্য করেছে এই কথাটা আজকাল প্রায়ই বলছে সুরমা। পীযূষকান্তির ছেলেমেয়ে তিনটি, পীযূষকান্তি যাদের নাকি আদর করে বলে 'পান্না-চুনী-হীরে', তারা হঠাৎ এক একটা সাপ হয়ে গেল তাহলে? সুরমা তাই তার স্বামীকে সর্বদা সাবধান করছে অসতর্ক পা না ফেলার জন্যে।

পান্না-চুনী-হীরেও হঠাৎ সাপ হয়ে যেতে পারে? প্রশ্নটা কোনও সময় সুরমার সামনে ভাষাহীন বিস্ময়ে উচ্চারণ করেছিল পীযূষকান্তি। কিন্তু সুরমা অবলীলায় উত্তর দিয়েছিল, হবে না কেন? না হওয়াই আশ্চর্য। অকারণ শুধু নিজের সাধ মেটাতে যে দুর্গতি ঘটালে তুমি ওদের।

অকারণ, শুধু নিজের সাধ মেটাতে! সেও একটা বিস্ময়। সেই সাধটা কী?

পীযূষ বোসের ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব্বাইকে জিগ্যেস করে, আচ্ছা বলুন তো আপনারা, এই সাধটা কি একটা

অভূতপূর্ব অন্যায় ? ইহ জগতে আর কেউ কখনো এমন অন্যায় সাধ করেনি ? করে না ? আর কেউ সে সাধ মেটায়নি, মেটায় না ? শুধু এই পীযূষ বোস প্রথম এই কাণ্ডটা করেছে ?

বলতে ইচ্ছে করে, সত্যি তো আর বলা যায় না ! তাছাড়া বলতে গেলেই তো পরিস্থিতি আর তার ইতিহাস বোঝাতে হবে ! সে তো আকাশে ধুলো ছোঁড়া হবে। অতএব বলা হয় না। বলতে পারে একমাত্র সুধাময়কে, বলেও, কারণ সুধাময় সব ইতিহাস জানে। বলতে গেলে সুধাময়ই 'নাটের গুরু'।

এই 'নাটের গুরু' শব্দটা সুরমার মন্তব্য থেকে গৃহীত।

কিন্তু সুধাময় নামের বন্ধুটা কি পিযূষ বোসকে উচ্ছন্নের পথ চিনিয়ে দিয়েছে ? যার ফলশ্রুতি পীযূষের স্ত্রী-সন্তানের দুর্গতি ঘটিয়েছে ?

নাকি কোনো এক কঠোর কৃচ্ছ্র সাধক গুরুর নাম সুধাময় ? পীযূষকান্তি বোস, যে নাকি এক নাম করা অয়েল কোম্পানীর পদস্থ অফিসার, সৌখিন রুচি, দিলদরিয়া মেজাজ, আর 'ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে চিন্তার বালাইহীনতাই যার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, সে লোকটা শুই কঠোর গুরুর কাছে হঠাৎ মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বসে কৃচ্ছ্রসাধনের পথে এগিয়ে চলেছে ? পীযূষ বোসের সেই সাধনাই তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পক্ষে দুঃখ দুর্গতিবহ ?

তা এক হিসেবে প্রায় তাই-ই।

বলতে গেলে গুরুদীক্ষাই।

যদিও সুধাময় সরকার অফিসে পীযূষ বোসের অধস্তন, তবু অন্য এক কারণে বন্ধুত্ব আছে। একদা নাকি দুজন একই স্কুলের ছাত্র ছিল। অফিসে এসে সেটা ধরা পড়ে।

স্কুলের সহপাঠি অতএব পুরনো খাতির রাখতেই হয়েছে। পীযূষ বোসই রেখেছে। নইলে সুধাময় হয়তো রাখতে আসতে সাহস করত না। পীযূষই 'তুমি' ডাকটা প্রচলন করেছে। পীযূষই মাঝে

মাঝে সুধাময়কে ডেকে চা খাইয়েছে, আর অফিসের সকলের সামনে সেই বাল্যবন্ধুত্বটিকে স্বীকার করেছে। কারণ পীযূষ বোস লোকটা অহঙ্কারী নয়।

তবে, মনে মনে যে পীযূষ সুধাময়কে কৃপার দৃষ্টিতে দেখেছে, তার কারণ আলাদা।

সুধাময় লোকটা চিরাচরিত প্রবাদের ভাষায় যাকে বলে 'ওয়ান পাইস ফাদার মাদার'। এটাই পীযূষের কাছে খুবই হাস্যকর। অফিসে কখনো এই কৃপাভাবটা প্রকাশ করেনি বটে, তবে বাড়িতে সুরমার কাছে নীলু, বুলু, টুটুর কাছে ঢালাও প্রকাশ করেছে।

সুধাময় যে টিফিনের পয়সা বাঁচাতে, অফিসে অমন উৎকৃষ্ট ক্যান্টিন থাকতেও, বাড়ি থেকে রুটি আলুচচ্চড়ি নিয়ে এসে খায়, এটা কি হাসির খোরাক নয়? তাও ক্যান্টিনের অর্ধেক খরচা তো কোম্পানীর। তবু—তবু ওই কিপটেমি সুধাময়ের।

রুটি! অফিসে! এ মা, ভাবাই যায় না।

বলেছে নীলু বুলু।

সুরমাও। মেয়েদের সঙ্গে গলা মেলানো তার চির অভ্যাস। মেয়েরা যখন এতটুকু, তখন থেকে। সুরমাও হেসে গড়িয়ে বলেছে, নাঃ নাঃ বাপু ভাবা যায় না। ক্যান্টিনের ওই গরম চপ, ফ্রাই, গরম কচুরী, আলুর দম, ছোলার ডালের লোভ সামলে কোন সকালের তৈরী হাতে-গড়া রুটি! মহাপুরুষ!

পীযূষ বোস এই হাসিতে পুলকিত হয়ে সুধাময়ের ব্যয় সঙ্কোচের আরো উদাহরণ পেশ করে 'মজা'র জোগান দিয়েছে।

সুধাময় নাকি অফিসে ঢোকার প্রারম্ভে যে জুতো-জোড়াটা পরে ঢুকেছিল, এতাবৎকাল সেইটাই পরে চলেছে। সুধাময় না কি সারা বছর একই প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরে অফিসে আসে, রবিবারে রবিবারে সাফ করে নিয়ে। যতক্ষণ না ছেঁড়ে ততক্ষণ সুধাময় একই দৃশ্যে দৃশ্যমান।

সুধাময়ের বাড়ির ঠিক সামনেই না কি বাস-স্টপ, তবু পাঁচ পয়সা ভাড়া বাঁচাবার জন্যে দুটো স্টপ আগে নামে সে, আর সারাদিনের ক্লান্ত শরীরে পুরনো জুতো ঘষটাতে ঘষটাতে অতটা পথ হেঁটে বাড়ি যায়।

এ শুনেও হাসবে না ওরা ?

গড়িয়াহাটের সেই পূবের বারান্দাওলা বাড়িটার বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারগুলোয় বসে সপরিবারে খানিকটা জমিয়ে গল্প করা পীযূষের বরাবরের অভ্যাস ছিল। ওই অভ্যাসের জন্যে পীযূষকান্তি কখনো আড্ডা কি তাসখেলার গাড্ডায় পড়েনি।

আসলে পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটা নিতান্ত নীচু পোস্ট থেকে উঁচুতে উঠেছে। অর্থাৎ নেহাৎ 'মধ্যবিত্ত' অবস্থা থেকে কিছুটা বিত্তের মুখ দেখা আর কি ! তাই চিত্তটা প্রায় 'মধ্যই' রয়ে গেছে তার।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ঘিরেই তার যা কিছু আনন্দ, পারিবারিক মিলনসুখই তার কাছে আদর্শ সুখ। 'ওদের জন্যেই আমি' এই মনোভাব নিয়েই জীবন কাটিয়ে আসছে সে। তাই অফিস-ফেরত আর কোথাও নয়, সোজা বাড়ি। দেরীও হ'ত না, অফিসের গাড়ি চড়ে আসত। অফিসারদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা ছিল কোম্পানীর। অবশ্য বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত না। গড়িয়াহাটের মোড়ে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে একজন ডিরেকটারকে নিয়ে চলে যেত কোথায় যেন। তা ওই মোড় থেকে তো পীযূষের বাড়িটা ছিল দু'মিনিটের রাস্তা। পীযূষের বাড়িটাই ওই মোড়ের সবচেয়ে কাছে পড়ত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত সুরমা সময় দেখে।

বাবা বাড়ি ফিরলে মেয়েরা পরীক্ষার পড়া ফেলেও সমবেত হ'ত ওই বারান্দায়। ইদানীং অবশ্য টুটু ঠিক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল না, বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে রাত হয়ে যেত, তবু চেষ্টা করত চলে আসবার, এবং সান্ধ্য আসরটা ভেঙে গেছে দেখলে খুবই অস্বস্তি পেয়ে দেরীর জন্যে নানান কৈফিয়ৎ দিতে বসত।

আর আবার কথা জমাবার জন্যেই হয়তো বলে উঠত, তোমার সেই বাল্যসখা সুধাময়ের খবর কি বাপী ?

অতঃপর ছেলেমেয়েরা তাদের প্রধান প্রসঙ্গে আসত। সে প্রসঙ্গটা অবশ্য ইদানীংই উঠেছিল, প্রসঙ্গটা হচ্ছে—গাড়ির। রেকর্ড চেঞ্জার, টেপ্‌রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি ছোটখাটো শখগুলো মিটে যাবার পর ধুয়ো উঠেছিল গাড়ির। তলে তলে ছেলেমেয়ের শখের ধোঁয়ায় ফুঁ দিচ্ছিল সুরমাও। যে পীযূষকান্তি বোসের কোনো একদা একটি ভালো রিস্টওয়াচ্‌ ছিল স্বপ্ন, সে-ও ছেলেমেয়ের এই আবদারকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে না দিয়ে ভালো কনডিশানের একখানা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ির সন্ধানেই ফিরতে শুরু করেছিল। বলেছিলও কাউকে কাউকে।

সুরমার মেজাজ ছিল উঁচুতারে বাঁধা, তাই সুরমা বলেছিল, কিনতে হলে বাপু নতুন গাড়ি কেনাই উচিত। কথাতেই আছে সস্তার তিন অবস্থা। তাছাড়া—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ির আবার গৌরব কী ?

টুটু মায়ের কথা উড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, নতুন গাড়ির আবদার করলে আর এ জন্মে গাড়ি হবে না তোমার মা, একটা এ্যাপ্লিকেশান ঝুলিয়ে রেখে দিন গুণতে গুণতে বুড়ো হয়ে যাবে।...

টুটুর মত হচ্ছে হাতে হাতে লাভটা হয়ে যাক। হাতে একবার পেলেই সে দু'মাসে পাকা চালক হয়ে গিয়ে লাইসেন্স বার করে নিয়ে শহর পয়লট্ট করে বেড়াবে।

নীলু বুলুরও একই মত।

বুলুও ধরে নিয়েছিল দাদার আগেই সে শিখে নেবে। নীলু অতটা ডাকাবুকো নয়, সে বলে গাড়ি চালানোর থেকে গাড়ি চড়া অনেক আরামের।

যাই হোক পীযূষকান্তি গাড়ি কেনার ইচ্ছেটিকে মনের মধ্যে স্থাপিত করে একদিন সুধাময়কে বলে বসেছিল, তুমি তো অনেক

তালে ঘোরো, একটা ভালো কনডিশানের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি যোগাড় করে দাও না ; পুত্ররত্ন তো পাগল করে তুলছেন।

শুনতে ভালো হবে বলে শুধু ছেলের নামই করেছিল।

তা বলেছিল ঠিক লোককেই। সুধাময় সরকার অফিসের সময় বাদে অন্য অনেক কিছুই ক'রে বেড়ায়। যার সরল বাংলা নাম দালালি। সেই দালালির মধ্যে অবশ্য জমি, বাড়ি, বাড়িভাঙা মালমশলা ইত্যাদি কেনা বেচার ব্যাপারটাই প্রধান, তবে মাঝে-মধ্যে গাড়িফাড়িও নাড়ে চাড়ে।....অতএব সুধাময়ের এতে উৎসাহিত হবারই কথা, কিন্তু সুধাময় তা হ'ল না। একটুক্ষণ পীযূষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলল, গাড়ি যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয় পীযূষ, চেষ্টা করলেই হতে পারে। কিন্তু তুমি আমায় বন্ধু বলে স্বীকার কর বলেই একটা কথা বলছি—

বলে থামল।

পীযূষকান্তি হেসে উঠে বলল, 'বলছি' ঘোষণা করে থেমে গেলে কেন ? যা বলবার বলে ফেল।

সুধাময় বলল, বলছি। বন্ধুকৃত্য হিসেবেই তোমায় কিছু বলতে চাইছি কিছুদিন থেকে—

* * * *

বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল পীযূষ।

পীযূষের হঠাৎ মনে হ'ল বাসের জন্যে সে যেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের গাড়িটা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট ক'জনকে নামিয়ে দিয়ে ডিরেক্টরকে নিয়ে চলে গেল সেটা করে? মনে হয়েছে যেন গতযুগের ব্যাপার।....পীযূষের সামনে দিয়ে কি অনেক বাস চলে গেছে, খেয়াল করেনি সে?

খুব অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে সে আজ, এটা ঠিক।...নিত্যকারের মতো আজও গড়িয়াহাটের মোড়ে অফিসের গাড়ি থেকে চারজনে নেমে পড়ার পর ঘোষাল যেন কী একটা বলেছিল, পীযূষ তার উত্তর দেয়নি, পরে মনে পড়ল সেটা।

কী বলেছিল কে জানে।

দূর! নতুন আর কী বলবে? সেই আক্ষেপ আর সহানুভূতিতে গলে পড়া গলায় বেদনা প্রকাশ তো? মিস্টার বোস, আপনাকে এখন আবার বাস ধরতে হবে। মুশকিল! এতো দূরে বাড়ি করলেন!

এই এক কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে ওরা পালা করে।... আগে টুক্ করে বাড়ি ঢুকে যেতেন। দু' এক মিনিট লাগত। এখন বাসের জন্যে দাঁড়াতে হবে। তারপর আবার অনেকটা দূর পাল্লায় পাড়ি দিতে হবে। আবার বাস বদল করতে হবে।

হবে তো হবে, তাতে তোদের কী?

এই রকম একটা উত্তর দেবার অদম্য ইচ্ছেকে চেপে রেখে ভদ্রতার হাসি হেসে বলতে হয় পীযূষকে, হ্যাঁ এই এক ঝঞ্ঝাট হয়েছে আর কি।

রাগে মাথা জ্বালা করলেও বলতে হয়।

ওরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায় এদিক ওদিক। ঘোষাল, চ্যাটার্জি, বিন্দুমাধব।

পীযূষকান্তি কেমন একটা জ্বালা জ্বালা চোখে তাকিয়ে থাকে ওই চলে যাওয়ার দিকে।

আজ তাকাতেও ভুলে গেছে মনে হচ্ছে।

আজ সেই একটা শব্দ যেন পীযূষকান্তি বোসকে তাড়া করে করে কোথায় নিয়ে গিয়ে একটা ছায়াছায়া শূন্যতার মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছে।

পয়সা দিয়ে তুমি—

মিনিবাসটার তন্বী তরুণী দেহখানির ছায়া চোখে ঝলসে ওঠা মাত্রই অজ্ঞাতসারে ডান হাতখানা প্রায় উঠেই পড়েছিল ; চট করে তাকে চৈতন্যে ফিরিয়ে আনতে হ'ল। তোলা হাতখানা যেন ভিজে ন্যাকড়ার ফালির মতো শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল। আর ওই তন্বী-তরুণী দেহধারিণী বাসটা পীযূষকান্তি নামের লোকটাকে 'ছুয়ো' দিয়ে চোখের সামনে ছায়া ফেলে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য! তার পিছু পিছু আর একখানা, ইঃ, তারপর আরও একখানা। শহরের সব মিনিবাসগুলোই কি আজ একই টিকিট ললাটে সেঁটে পথে বেরিয়েছে পীযূষকে লোভের হাতছানি দিয়ে ডেকে সংকল্পভ্রষ্ট করতে ?

কিন্তু পীযূষকান্তি বোসের সংকল্পভ্রষ্ট হবার উপায় নেই। পাছে হঠাৎ হয়ে পড়ে, তাই সে অফিসে আসতেও আগে থেকে সাবধান হয়ে বেরোয়। পকেটে মাত্র কিছু খুচরো পয়সার সম্বল থাকলে, কোন সাহসে ওই উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচীর হাতছানিতে সাড়া দিতে যাবে ?

শুধুই কি ওদের ? আরো সহস্র লোভের হাতছানিকে উপেক্ষা করে করে চলতে হচ্ছে না এখন পীযূষকে ? পীযূষের গুরু বলেছে না, ইষ্টদেবতাকে পেতে যেমন একটি মুহূর্তও অপচয় না করে শ্বাসে-প্রশ্বাসে

ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়, এটাও ঠিক সেই ভাবেই ভাবতে হবে পীযূষ! শ্বাস-প্রশ্বাসে হিসেব রাখবে একটি নয়া পয়সাও যেন বাজে খরচ না হয়। আমার মতে এমনিতেই প্রতিটি সংসারী মানুষের ভাবা উচিত—মিনিমাম নেসেসিটির বাইরে যা কিছু করছি, অন্যায় করছি। তা মনে কিছু কোরো না ভাই, তুমি মানুষটি এ যাবৎ তার উল্টো পথেই চলে এসেছ। এখনো সাবধান হও।

শুনে শুনে পীযূষেরও কি মনে হতে শুরু করেছিল, সে ভুল পথেই চলে এসেছে এতাবৎকাল? নাঃ, প্রথমে নয়। প্রথমে এসব কথা অবাস্তব মনে হয়েছে, গুরুবাক্যকে অমৃতং বালভাষিতং বলে উড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, আরে বাবা, জীবনের বেশীর ভাগটাই খুইয়ে বসে আছি, এখন আর পথ বদল।

গুরু বলল, এখনো সময় আছে। এখনো চেষ্টা করলে—

এতক্ষণে একখানা আকাঙ্ক্ষিত বাস এসে দাঁড়াল। পাদানীতে লোক ঝুলছে।···একটা আলপিন্ ঢোকানো যায় এমন খাঁজও দেখা যাচ্ছে না।···তবু—পীযূষকান্তি বোস নামের—এক সুটেড বুটেড ভদ্রলোককে ওর মধ্যেই চালান করে দিতে হবে।

উপায় কি?

আরো অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় নাকি? আরো পাঁচ-খানা ছেড়ে দিলেও কি একখানা হালকা বাস পাওয়া যাবে?

আর তার পর?—আবার যেটা ধরতে হবে? শহরতলীর এই বাসগুলো সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে পীযূষকান্তির—এদিকে রাত যত বাড়ে ভীড় তত বাড়ে।

পীযূষকান্তির অফিসের গাড়ি যেখানে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল, তারই কাছাকাছি একটা বাড়ির একতলা ফ্ল্যাটের জানলায়

ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটা বলে উঠল, ওই যে ফাদারের গাড়ি এসে গেল।

মেয়েটা গ্রীলের খাঁজে যতটা উঁকি মারা সম্ভব তা মেরে দুঃখু-দুঃখু গলায় বলল, এসে গেলেই বা কী! আবার তো এখন দু'খানা বাস বদলে তবে বাড়ি যেতে হবে। সত্যি কী বিশ্রী যে করলি তোরা ভাবাই যায় না।

ছেলেটা কড়া গলায় বলল, এই খবরদার বলছি পপি, 'তোরা' বলবি না। আমি করেছি?

তা জানি!

পপি আরো করুণ গলায় বলে, তা জানি,—তুই বুলু নীলুদি মাসিমা সবাই তো ফাইট্ করেছিলি—

হুঁ! কাজ হ'ল না কিছু। একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।

অথচ আগে মেসোমশাই কী ভালো ছিলেন। তোরা যা বলতিস তাই হ'ত। তাই না? আর মাসিমার কথা তো সর্বদা শিরোধার্য ছিল। কী যে হ'ল!

হ'ল আর কি? ঘাড়ে ভূত চাপল। স্ত্রীপুত্রের জন্যে মাথা গোঁজার আশ্রয় করলেন ফাদার। পুত্রের দায় পড়েছে ফাদারের ওই খামার বাড়িতে গিয়ে মাথা গোঁজার! কী করব, এখন শালা নেহাৎ গাব্‌গাড্ডায় পড়ে আছি তাই—

এই টুটু, ফের খারাপ কথা বলছিস? কী প্রমিস করেছিলি সেদিন মনে নেই? থাম পপি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে মাইরি। এতে কি আর মুখ দিয়ে তোর গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষা বেরোবে? নিজেকে শালা ছাড়া আর কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না। তবে দেখে নিস তুই—এই গাড্ডা থেকে একবার ছিটকে উঠতে পারলে এ শালা আর ফাদারের ওই প্রেমের খামারবাড়িতে নাক গলাতে যাচ্ছে না। নেহাৎ গাব্বু পিল হয়ে পড়ে আছি তাই—

ছাত্রাবস্থাকে টুটু রোস 'গাব্বু পিল' হয়ে থাকার অবস্থা বলে। পপির শুনে শুনে কান ভোঁতা। তাই পপি তার দুঃখে সহানুভূতি না জানিয়ে ভেংচি কেটে বলে উঠল, আর গাব্বু থেকে উঠে পড়লেই বুঝি তোর দশটা হাত বেরোবে? ইয়া মোটা মাইনের একটা চাকরী বসানো আছে তোর জন্যে?

চাকরী? কলেজ থেকে বেরিয়েই আমি একটা চাকরীতে গিয়ে ঢুকব? এই তোর 'এম্' পপি?

পপি আরো ভেংচে বলে, আমার কি 'এম্' সেটা তোকে বলে কি হবে শুনি? তুই বলছিস তাই বলছি। তুই এমন বাৎচিত করিস, যেন এই পরীক্ষাটা দিতে পারলেই স্বাধীন হয়ে যাবি। নিজেকে একটা 'আস্ত মানুষ' বলে দাঁড় করাতে এখনো তোর কতদিন লাগবে, তার আন্দাজ আছে? এখনো কত কাল ফাদারের ভাতে থাকতে হবে, ফাদারের ওই খামারবাড়ির ছাতের তলায় মাথা গুঁজতে হবে ভেবে দেখেছিস?

টুটু যাকে বলে বেদনাবিদ্ধ গলায় বলে, ও কথা মনে করিয়ে দিসনি পপি! জননী কত আশা দিয়েছিল পাশ করে বেরোলেই ক্যানাডা পাঠিয়ে দেবে ওর সেই কোন তুতো জামাইবাবুর কাছে। সেখান থেকে ছাপ মারা হয়ে আরো হায়ার স্টাডিতে চলে যাব। সব গুবলেট হয়ে গেল।···এখন বলতে গেলে জননী বলে, একেই মাথার মধ্যে সর্বদা আগুন জ্বলছে—তার ওপর আর আগুন বাড়াতে আসিসনে। আর কিছু হবে না তোদের।

পপি মলিন গলায় বলে, তা বলতেই পারেন। মাসিমার কী দুর্দান্ত ইচ্ছে ছিল তোকে ইয়ে করে মানুষ করতে। তুই অবিশ্যি নিজে একটা বাজে, জীবনে কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করতে পারিসনি। তবু যাহোক করে একবার ওদেশে পাঠিয়ে দিলে যা হয় কিছু হতে পারতিস। এই তো আমার ছোটমাসির ভাগ্নে না কে, প্রায় একটা হাবা বোবা গোছের ছিল। তিন বছর ঘষটে হায়ার

সেকেণ্ডারি পাশ করেছিল, বোস্টনে তার দিদি-জামাইবাবুর কাছে বেড়াতে যাওয়ার ছুতোয় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাকে, ব্যস, কী যে হ'ল কে জানে, এখন নাকি সেখানে হাজার হাজার ডলার রোজগার করছে।

গুজবে কান দিসনি পপি!

গুজব মানে? ছোটমাসি মিছে কথা বলেছে?

আচ্ছা বাবা, না হয় সত্যিই হ'ল, শুনে টুটু বোসের কী ফায়দা? ফাদার যে স্রেফ্ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতেই তোর আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটিয়ে দিল, সেইটা ভাবলেই মেজাজ ঠিক থাকে না।

সত্যি রে—পপি বলে, মাও দুঃখু করছিল, একে বলে সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া! তোর টুটুর বাবা এখানে কী রাজার হালে ছিল, আর এখন সেই কোন পচা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে—সত্যি রে মেসোমশাইকে দেখলে এমন দুঃখু হয়। অফিসের গাড়ি থেকে নামতেন, কেমন টগবগ করতে করতে বাড়ি পৌঁছে যেতেন, আর এখন—

কথা শেষ করার আগেই টুটু ফট করে পপির একটা কাঁধ খামচে ধরে বলে ওঠে, এই পপি কী বলেছে মাসীমা? 'তোর টুটু'!

পপি বলে, ইস! খামচে দিচ্ছ কেন? লাগে না আমার? বলবে না কেন? সব সময়ই তো বলে।

সব সময়ই বলে? তার মানে তুই খুব পাকামি করিস!

পাকামি আবার কী? তুই আমার বন্ধু নয়? লালির কথাতেও তো বলে, তোর লালি!

হুঁ! খুব এঁচোড়ে পেকেছ। যাক চলি আজ।

এক্ষুনি যাবি?

এখন থেকে শুরু না করলে? ঘণ্টা দুই তো লাগবে।

দূর! এত বিচ্ছিরি হয়ে গেল ব্যাপারটা! জানিস তোদের ওই

ফ্ল্যাটটায় যারা এসেছে, আমি তাদের দিকে তাকাই না! এত রাগ হয় ওদের দেখলে!

টুটু একটি গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ওদের আর কী দোষ!

তা জানি! তবু তোদের বারান্দায় একটা গুঁফো বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে দেখলে রাগ হয় না?

'যাই যাই' করেও আরো মিনিট চল্লিশ কাটিয়ে তবে বিদায় নেয় টুটু।

পপি দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে। আহা কী সুখের দিনই ছিল আগে! টুটু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও বাড়ি ঢুকে যেত, দেখে তবে পপি দরজা থেকে নড়ত। কী যে দুর্মতি হ'ল মেসোমশাইয়ের!...কারো কথা শুনল না।

পপিরাই কি বলেনি? পপির মা বাবা পপি নিজে। অতদূরে না যাওয়ার জন্যে। পীযূষকান্তি বলেছে—বাঃ তোমরা বেড়াতে যাবে। সেটাতে আরো মজা হবে। বেশ আউটিং আউটিং লাগবে।

পীযূষ যখন বাড়ি এসে পৌঁছলো, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। আশীর বি বাসটায় খানিক এসেই ব্রেক্‌ডাউন হয়ে বসল।

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন সে একেবারেই জবাব দিল তখন সেই বালিশে তুলো ঠাসার মতো যাত্রী ঠাসা বাসটাকে পরিত্যাগ করে সবাই একে একে দুই দুইয়ে, অবশেষে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ে যে যেমনে পারে গন্তব্যস্থলে রওনা দেয়।

পীযূষ অবাক হয়ে বসে দেখছিল বাসের মধ্যে কী অকথ্য মন্তব্যের ঢেউ। যন্ত্র নামক জিনিসটা যে মাঝে মাঝে বিকল হয়েই থাকে এটা যেন এরা মানতে রাজী নয়। এদের মতে এটা চালক এবং পরিচালকের সম্পূর্ণ বদমায়েসী।

এই বদমায়েসীতে তাদের লাভ কী, কোন মোক্ষফল পাবে তারা এর থেকে, তা কেউ ভেবে দেখতে রাজী নয়।

এরা কারা ?

এদের সঙ্গে পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটার শ্রেণীগত কোনো মিল আছে ?

অথচ এখন পীযূষকান্তি এদেরই একজন।

তার মানে সুরমার কথাই ঠিক।

কিন্তু কেন আমি হঠাৎ পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য কিনতে বসলাম ?

ভাবতে গিয়ে বেশ খানিকটা পিছনে হঠে গেল পীযূষ। ফিরে গেল সেই গাড়ির প্রসঙ্গে।

গাড়ি থেকেই কথাটা উঠিয়েছিল সুধাময়।

বলে উঠেছিল, তুমি আমায় বন্ধু বলে স্বীকার কর বলেই বলছি পীযূষ, গাড়ির চিন্তাটা ছাড়, তার আগে একখানা বাড়ি করে নাও—

শুনে পীযূষ হো হো করে হেসে উঠেছিল। তুমি এমনভাবে কথাটা বললে সুধাময়, যেন তার আগে একজোড়া জুতো কিনে নাও অথবা একটা ছাতা—

সে হাসিতে কিন্তু অপ্রতিভ হয়নি সুধাময়, বরং তার উত্তরের যুক্তিটা আরো জোরালো হয়েছিল। ব্যাপারটা যে এক হিসেবে তাই, সেটা বুঝিয়েছিল তুলনা দিয়ে। ভুল বলনি পীযূষ, এক হিসেবে তাই, পায়ের তলায় পা রাখবার আশ্রয় আর মাথার ওপর ছাতা। এরই নাম বাড়ি। লোকে যাকে চিরকাল বলে আসছে, মাথা গোঁজার আশ্রয়।

পীযূষ অবশ্য তাতে গলেনি, হেসেই বলেছিল, বুঝলাম তো 'সে কথা, কিন্তু একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কেনবার টাকায় তো আর বাড়ি হয় না ? তাও কি ওই গাড়ির টাকাটাই মজুত আছে ? এখানে সেখানে যা কিছু আছে কুড়িয়ে কাটিয়ে—নেহাৎ পুত্র কন্যার বড়োই আকাঙ্ক্ষা—তাই—

সুধাময় গম্ভীরভাবে একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,

নজর দিচ্ছি না ভাই। তবে বলছি, ভগবানের ইচ্ছেয় এতগুলো করে টাকা মাইনে পাচ্ছ। সবই হরিরলুট করে ফেলছ? আখেরটা একটু ভাবছ না? তোমাকে দেখলে তো মনে হয় মাসের তিরিশ তারিখ না আসতেই পকেট গড়ের মাঠ করে বসে থাক।

. পীযূষকান্তি অবশ্য এ ধিক্কারেও দমেনি তখন, হেসে হেসেই বলেছিল, ধরেছ ঠিক। মানতেই হবে তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে। আটাশ তারিখ থেকেই গিন্নীর কাছে ধর্ণা দিই। তোমার কিছু থাকে তো দাও, এ দু'তিনটে দিন পার হই। তা তিনিও এককাঠি সরেশ। হয়তো মাসের দু'দিন থাকতে একটা দামী শাড়ি কিনে বসে থাকেন।

চমৎকার!

সুধাময় বলেছিল, এই অনুমানই অবশ্য করেছিলাম আমি। কিন্তু তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি পীযূষ, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

পীযূষ একথাও প্রায় অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিয়েছিল। আরে ছাড় ভাই, কার কখন কোন দিন থাকছে আর যাচ্ছে ঠিক আছে কিছু? গিন্নীর যে আবার শখের প্রাণ গড়ের মাঠ। বলেন, মানুষের মতন না বাঁচতে পারলে বাঁচার কোনো মানে নেই। বলেন, ভবিষ্যতে পাছে অসুবিধে ঘটে, এই ভাবনায় ভাবনায় জীবনের সব থেকে ভালো দিনগুলো অসুবিধে ভোগ করে করে কৃচ্ছ্রসাধনে কাটিয়ে টাকা জমাবে, এর থেকে বোকামি আর নেই। যতটা সম্ভব ভালোভাবে থাকব, ভালো খাব পরব, ইচ্ছেমতো শখ সাধ মেটাব, এইটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংসারী মানুষের। তারপর যা অদৃষ্টে আছে। অদৃষ্ট যদি মানতে হয়, ভবিষ্যৎ ভাবতে বসার মানে হয় না। ছেলেমেয়েদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন মহিলা। আমি যদি একটু টানা-কষার চেষ্টা করি, ওরা দুয়ো দিয়ে বলে, বাবা কিপটে হয়ে গেছে। বলে, গোয়ালের গরুছাগল, খোয়াড়ের হাঁস-মুরগী, এদের জীবনটা তো আর মানুষের জীবনের আদর্শ হতে

পারে না। —তবে কি আর অসৎপথে রোজগার করতে যাচ্ছি? তা নয়। ওই যত্র আয় তত্র ব্যয়, এই আর কি!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বলে তখনকার মতো চুপ করে গিয়েছিল সুধাময়। কিন্তু যে লোক পরোপকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে তো আর একেবারে চুপ করে যেতে পারে না?

আবার একদিন সে হঠাৎ বলে বসে, পীযূষ, তোমার ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত?

পীযূষ এ প্রশ্নের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। বলেছিল, আর বল কেন? ঢুকেছিলাম তো সাড়ে চারশোয়, দু'বছর না যেতেই পুরো পাঁচ করে নিয়েছেন প্রভু।

সুধাময় একটু গুম হয়ে থেকে বলল, কতদিন আছ ওখানে?

কতদিন? কতদিন? নাইনটিন সিক্সটি থ্রীর এপ্রিলে। তা প্রায় বছর বারো হ'ল।

সুধাময় আরো গম্ভীরভাবে বলে, তার মানে এ যাবৎ তুমি বাড়িওয়ালার চরণে প্রায় একাত্তর হাজার টাকা ধরে দিয়েছ। সত্তর হাজার আটশো।

পীযূষ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, আরে ব্যস! একেবারে মুখে মুখে হিসেব। কিসের ছাত্র ছিলে বল তো? অঙ্কের?

সুধাময় বলে, জীবনের পথে প্রতিপদে হিসেব কষতে কষতে অঙ্কের ছাত্রই বনে গেছি ভাই! কিন্তু ভেবে আমারই বুকটা ধ্বসে যাচ্ছে পীযূষ, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তুমি ওই পেটমোঠা বড়লোকটাকে জুগিয়ে এসেছে, শুধু একটু থাকার বিনিময়ে। অথচ তোমার পৈত্রিক ভিটের ভাগ রয়েছে—

আরে দূর, সেখানে তো শরীকি ব্যাপার। ভাগে কুল্লে একখানা করে ঘর—

তবু তো ঘর!

সুধাময় দৃঢ় গলায় বলে, একটু কষ্ট করে কোনোমতে কটা বছর

কাটিয়ে দিতে পারলেই আজ তুমি নিজে বাড়িওয়ালা হয়ে বসতে পারতে। সত্তর বাহাত্তর হাজারে শহরতলীতে অট্টালিকা হয়ে যেত। একটা তলা ভাড়া দিতে, আর একটা তলায় বাস করতে, সময় অন্তর আরো তলা বাড়াতে পারতে—ইস! ভেবে আমারই যেন হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে পীযূষ! সবদিকে তোমার এত বুদ্ধি, অথচ—

সেই শুরু!

সেই প্রথম পীযূষ মনে মনে নিজেকে সুধাময়ের থেকে 'বোকা' বলে স্বীকার করে। সত্যি যদি পারা যেত কি মনোরম হ'ত সেই অবস্থাটি! নিজের তৈরি অট্টালিকায় আছি, আবার বাড়িওয়ালা বনে বসেছি। আহা!

ভেবেছিল। প্রায় 'অবাস্তব' ভাবেই ভেবেছিল।

তাই বাড়ি এসে স্ত্রীপুত্রের কাছে সুধাময়ের অঙ্ক মেলানোর চমৎকার পদ্ধতি নিয়ে হাসাহাসি করতে ছাড়েনি। বলেছিল, ইস! একাত্তর হাজার টাকা! একসঙ্গে কেমন দেখতে তাই ভাবছি! গোড়ার জীবনে ওই সুধাময় সরকারের শিষ্য হয়ে পড়তে পারলে মন্দ হ'ত না, কি বল?

মা কিছু বলার আগে বুলু ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছিল, ওই কিপটে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশী মিশোনাতো বাবা! মন নীচু হয়ে যাবে।...জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সেই একখানা ঘরের মধ্যে জীবন কাটিয়ে টাকা জমানো! উঃ! ভাবা যায় না!

বুলু তখন সবে হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছে, কিন্তু কেমন করে যেন মাতব্বরিতে সকলের থেকে প্রধান ভূমিকা নিয়ে বসে আছে।

অতএব যথারীতি সুরমাও মেয়ের কথা সমর্থন করে বলে উঠেছিল, যা বলেছিস। কিপটেমি একটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। ...এর পর কোনোদিন হয়তো তোমার সুধাময় বলে বসবে এতকাল

যত চালে ভাত খেয়ে এসেছ, সেটা না খেয়ে জমাতে পারলে, তুমি বড়োবাজারে একখানা চালের আড়ত খুলে বসতে পারতে।

শুনে অবশ্য ছেলেমেয়েরা হাসির বন্যা বইয়েছে। অতঃপর ওরা হি হি করে দৈনন্দিন সব কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে তুলনা দিতে বসে, এই দিদি, ধর আমরা যদি সবাই মিলে কলগেটের বদলে ঘুঁটে কয়লার ছাই দিয়ে দাঁত মাজতাম, তাহলে কত টাকা জমাতে পারা যেত? সারা জীবনের হিসেব কষবি কিন্তু। দিদি গড়িয়ে পড়ে বলে, বাড়ির সব ক'টি সদস্যের জীবনের পরিধি তো এক নয়, হিসেবটা বরং বাবার ওই বন্ধুকে করে দিতে বললে ভালো হয়।

এই টুটু, অ্যাভারেজে আমরা মাসে ক'টা করে সিনেমা দেখি? একটা হিসেব কষে ফেলনা। ওটা তো শুদ্ধ বাংলায় কি বলে 'অবশ্য প্রয়োজনীয়ের' লিস্টে পড়ে না।

আবার হি হি!

হি হিটা চালিয়ে যায় কিছুক্ষণ এবং শেষতক ন্যূনতম প্রয়োজনীয়ের খাতে যা ধার্য করে তা হচ্ছে, লোটা-কম্বল, ছাতু-লঙ্কা, গামছা-কৌপীন, ফুটপাত-গাছতলা।

স্ত্রীপুত্র পরিবারের এই হি-হির বন্যায় ভেসে গিয়ে সুধাময়ের পরামর্শের হাস্যকর অবাস্তবতা অনুধাবন করেছিল পীযূষ!...সত্যি বাড়িভাড়া না দিলেই কি ওই সত্তর একাত্তর হাজার জমতো পীযূষ কান্তি বোসের? তা হয় না।

হয় না।

অতএব সেই গাড়ির চিন্তাতেই থাকে পীযূষ। সুধাময়কে আর বলতে হয় না, একটা সুযোগ হাতের কাছে এসে যায়। অফিসের যে গাড়ি দুটো সাহেবদের আনা নেওয়া করে, তার একখানা কিছু পুরনো হয়ে যাওয়ায় সেটা বাতিল করে নতুন গাড়ি কেনা হবে এমন একটা খবর কানে অসেতেই চঞ্চল হয়ে

ওঠে পীযূষ, এবং খবরটা যে সঠিক তার সন্ধান নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টার সূত্রেই কথাটা সুধাময়ের কর্ণগোচর হয়ে গেল।

অফিসের পরে কথাটা পাড়ল সুধাময়, দীনেশের গাড়িটা নাকি তুমি কিনছ ?

দীনেশ ড্রাইভার। কিন্তু গাড়িকে চিহ্নিত করতে সবাই বলে থাকে 'দীনেশের গাড়ি', 'আনোয়ারের গাড়ি'।

পীযূষ একটু অপ্রতিভভাবে বলে, একেবারে কিনে ফেলেছি এমন নয়। শুনছিলাম গাড়িটা—

তার মানে ভূতটা ঘাড় থেকে নামেনি। সুধাময় অভিযোগের গলায় বলে, অথচ আমি তোমার জন্যে একটা বাড়ি খুঁজতে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি।

বাড়ি খুঁজতে ?

পীযূষের এই অবাক প্রশ্নে সুধাময় উদাত্ত গলায় বলে, হ্যাঁ বাড়ি খুঁজতে। ভেবে দেখছি তোমার যা দিলদরিয়া স্বভাব, তাতে টাকা জমিয়ে কিছু হবে না তোমার। একেবারে তৈরি বাড়ি কিনে ফেলতে পারলে—

কিনে ফেলতে পারলে ?

হো হো করে হেসেছে পীযূষ, স্বপন দেখ প্রবাল দ্বীপে তুলব আমি বাড়ি। তা স্বপ্নীয় টাকা দিয়ে যদি কেনা যায় তাহলে মন্দ নয়। ওসব কথা ছাড় ভাই, বাড়ি ফাড়ি আমার হবে না। হাজার আষ্টেক টাকার একটা ইনসিওর ম্যাচিওর করেছে, তাই ভাবছি গাড়িটা ওটার মধ্যে যদি হয়ে যায়।

কিন্তু সুধাময়ের যে প্রতিজ্ঞা অবোধ বন্ধুটার হিত না করে ছাড়বে না। অতএব অনেক যুক্তি-তর্কের জাল বোনে সে, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে সে যুক্তিকে শক্ত করে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে যে টাকা ধার নেওয়া যায়, একথা মনে পড়িয়ে দেয়, এবং এই কথাটাই মনে ধরিয়ে দেয় বন্ধুটিকে পীযূষের মতো উড়নচণ্ডী লোকের টাকা জমার আশা

বৃথা, কিন্তু পীযূষের মতো নীতিবাগীশ লোকের ধার শোধ হয়ে যাবেই।

অতএব—

পীযূষ হেসে বলে, অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ ?

আরে বাবা তা নয়। 'অতএব'—দুই আর দুইয়ে চার। বাড়ি করাটা ঘৃতং পীবেৎ-এর পর্যায়ে পড়ে না ভাই।

নাঃ, তুমি দেখছি আমার বাড়ি না করিয়ে ছাড়বে না। তা ভাগ্যে থাকে কখনো হবে ভাই, এখন গাড়িটা হয়ে যাক। ছেলেমেয়েরা তো—

গাড়িটা হয়ে যাক! এত পরেও ?

পীযূষ কি তার নির্লজ্জতা দিয়ে বন্ধুকে লজ্জিত করে ফেলতে সক্ষম হ'ল ?

নাঃ, সে আশা করা যায় না।

পরোপকারীর মতো নির্লজ্জ আর কে আছে ?

সুধাময় তখন বোঝাতে বসল একখানা গাড়ি কেনা থেকে সংসারে কী পরিমাণ অশান্তি ঢুকতে পারে।

গভীর গম্ভীর সুর তার তখন।

বাড়ি জিনিসটা হচ্ছে সকলের, কেমন কিনা ? সকলেই মোটামুটি সমান সুবিধে ভোগ করে, কিন্তু গাড়ি ? গাড়ি থেকে কি বাড়ির সবাই সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধে পেতে পারে ? হয় না ভাই হয় না, সুধাময় দার্শনিকের হাসি হেসে বলে, ওই এক গাড়ি কেনার থেকে কত সোনার সংসার ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম।··· আমারই এক ভায়রাভাই, এই ঠিক তোমারই মতো স্ত্রী ছেলেমেয়ের প্ররোচনায় গাড়ি কিনেছিল। অতঃপর কী হ'ল ? বলি শোন—গাড়ি পেয়েই ছেলে রাতদিন শহর পয়লট্ট করে বেড়ায়, তার টিকি দেখা যায় না। তাই বাপ একদিন বলে ফেলেছিল, হ্যাঁরে গাড়িটা যদি তুইই সারাদিন অকুপাই করে থাকবি, তাহলে আর সবাই একটু চড়ে কখন ?

ঝপ করে ছেলে গুম হয়ে গিয়ে বলল, ওঃ! আমি সারাক্ষণ অকুপাই করে রাখি, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দেওয়া হয় না?

বাবা প্রমাদ গণে তাড়াতাড়ি বলেছিল, আহা সে কথা কি বলছি? আমাকে তো রোজই আনা নেওয়া করছিস। মানে তোর মা বলছিল, গাড়ি কেনা হয়েছে এইটুকুমাত্র কানে শুনেছি, একদিন কালীঘাটে গঙ্গাস্নান পর্যন্ত যাওয়া হ'ল না। ব্যাস! হয়ে গেল। ছেলে বলল, ঠিক আছে, কাল থেকে যেন মা ঘরের গাড়িতে রোজ কালীঘাটেই যান। আমি আর ওর মধ্যে নেই।

'নেই' মানে হাতও দেবেন না আর। বোঝ ব্যাপার! গাড়ি চালাতে আর কে জানে?···মেয়ে বলল, ঠিক আছে। দাদার যখন এত অহঙ্কার, আমি শিখে নিচ্ছি। শুধু মাস দুই একটা ড্রাইভার রেখে দাও।···রাখা হ'ল তাই। তখন সমস্যা, যুবতী মেয়েকে কী করে রোজ ড্রাইভারের সঙ্গে একা ছাড়া যায়? তবে মা যাক সঙ্গে।···মা রোজ সংসার ফেলে যায় বা কি করে? যাওয়া হয় না, মেয়েরও শেখা হয় না। অগত্যা ড্রাইভারই থেকে যায়। সে থেকে যায় মানে সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই যেতে থাকে। বেশী পেট্রোল যায়। যখন তখন 'পার্টস' খারাপ হয়ে যায়, রোজ রোজ গাড়ি হাসপাতালে যায়, ঝামেলার একশেষ। এদিকে আবার রবিবার ড্রাইভারকে ছুটি দিতে হয়, অথচ গেরস্থ লোকের যা কিছু বেড়ানো ফেড়ানো তো ওই রবিবারেই? কাজেই প্যাঁজ পয়জার দুই হতে থাকে। ছেলে বসে বসে মজা দেখে, মা রাগ করলে বলে, একবার যখন ও গাড়ি ছোঁব না বলেছি, আর আঙুলও ঠেকাব না।

শেষপর্যন্ত ভায়রাভাই রাগ করে বেচেই দিল গাড়িটা। আর তখন ছেলে বলে বেড়াতে লাগল, একেই বলে, 'গরুর ডাবায় কুকুর'। নিজেরাও চড়ল না, আমাকেও চড়তে দিল না।

কিন্তু শুধুই কি নিজের ভায়রাভাইয়ের বাড়ির ব্যাপার বলেই থামল সুধাময়? বলল না এর, ওর, তার আর পাড়াপড়শীর বৃত্তান্ত?

কাদের বাড়িতে ভাই ভাইয়ের গাড়িতে চড়ে না, বাপ ছেলের গাড়িতে পা ঠেকায় না, মা ছেলের গাড়িতে ছেলের বৌয়ের সঙ্গে চড়ে না, বোন গাড়িটাকে দাদার গাড়ি না বলে 'বৌদির গাড়ি, এবং সে গাড়ি চড়বার অফার পেলে অবজ্ঞায় নাক কুচকে প্রত্যাখ্যান করে ট্যাকসি ডাকতে পাঠায়, এ সব বিবরণ দাখিল করে করে বন্ধুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাতে চেষ্টা করে সুধাময়।

এবং শেষ ভাষ্য দেয় গাড়ি কেনা মানেই পয়সা দিয়ে অশান্তি কেনা। ওই গাড়ি নিয়ে কত মান অভিমান ঈর্ষা অপমানের সমস্যা দেখলাম ভাই। বলে স্বামী স্ত্রীতেই কত ইয়ে হয়ে যায়। হবেই বা না কেন? একটা পরিবারে একখানা মাত্র গাড়ি, আর একটা পরিবারে একথালা মাত্র ভাতে তফাৎটা কি? কেবলমাত্র বাড়ি ছাড়া কোনো জিনিসই সম্পূর্ণভাবে সকলের ভোগে লাগে না। জামা নয়, জুতো নয়, ছাতা নয়, কোনো কিছুই নয়।

পীযূষকান্তি একটা দুর্বল প্রশ্ন করেছিল সবাইয়ের মনই কি সংকীর্ণ?

সুধাময় প্রবল উত্তর দিয়েছিল, বেশ মানলাম না হয়, তা সকলের মনই উদার নিরভিমান হ'ল। কিন্তু সংসারের সব মেম্বারেরই তো একই দিকে গন্তব্যস্থল হতে পারে না? অথবা একই সময়? তা হ'লে? বাড়াভাতের থালাটা কার ভাগে পড়বে? গাড়ি খানা নিয়ে কে কোন দিকে যাবে?

কিন্তু বাড়ি? যে যেমন পথেই চল, বাড়ি সবাইকেই সমান আশ্রয় দেয়।·····

ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর ক্ষয়।

তিল তিল করে তিলোত্তমা গড়ে ওঠে।

গাড়ির চিন্তা সরিয়ে রাখে পীযূষ।

অবশ্য বাড়িটাকেও খুব ধরে না, চুপচাপ থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন টগবগ করতে করতে এল সুধাময়, নাকি জলের দরে

একখানা বিরাট বাড়ি চলে যাচ্ছে, পীযূষ যদি তাকে খপ করে চেপে ধরে।

একতলা বাড়ি বটে কিন্তু অনেকখানি জমির ওপর। চারিদিক খোলা, বনেদী প্যাটার্ণের বাড়ি, উঠোন দালান, সারিবন্দী ঘর, সর্বোপরি চমৎকার একখানা ঠাকুর দালান। মানে রীতিমতো একটা সম্পত্তি।

ঠাকুর দালান!

ঠাকুর দালান নিয়ে কী করব আমি? হেসে ওঠে পীযূষ।··· সুধাময় বলল কী না করবে? প্রতিমা এনে পুজোই করতে হবে—এমন কি মানে আছে? ড্রয়িং রুম করবে। কী মোটা মোটা থাম, তিন থাক খিলেন, সে একেবারে দেখবার মতো।

পীযূষ বলল, তা এমন বনেদী ঠাকুরদালানওলা বাড়িটা কোথায়? পাথুরেঘাটায়? ঠনঠনে কালীতলায়? নাকি জোড়াসাঁকোয়?

সুধাময় আহত হ'ল।

ওইসব ঘিঞ্জি জায়গার খবর এনেছে সে বন্ধুর জন্যে? ওসব জায়গায় চকমিলনো বাড়ি আর মোটা থামওয়ালা ঠাকুরদালান থাকতে পারে, কিন্তু খোলামেলাটা কোথায়? আশেপাশে তো চোদ্দ শরীকের দেওয়াল। না ওই পুরনো কলকাতার দিকে নেই সুধাময়, ওদিকের বাতাস পাথরচাপা। মনের বাতাসও। জান না 'উত্তরে হিমালয়' যার ওদিক থেকে প্রগতির বাতাস বয় না। যে চিরদিন চিরনিরুত্তর। সুধাময় খবর এনেছে দক্ষিণের। যেদিকে 'অগ্রসরতা'র বাতাসে ভর করে কলকাতা অগ্রসর হয়ে চলেছে 'গ্রেটার ক্যালকাটা' বানাবার তালে।

গড়িয়াহাটে রয়েছ তুমি, তার হাটটা বাদ দিয়ে চলে যাও সোজা শুধু 'গড়িয়ার' পথ ধরে। যেতে যেতে গিয়ে পড়লে বিখ্যাত গ্রাম রাজপুরে, পড়লে আর পেয়ে গেলে সেই মোটা মোটা থাম দেওয়া ঠাকুরদালানওয়ালা বাড়ি।

শুনে পীযূষ আর নেই।

রাজিপুর ? রাজপুরে—বাড়ি কিনতে যাব আমি ? নাঃ, তোমার মাথাটা স্রেফ খারাপ হয়ে গেছে সুধাময় ! বাড়িতে গিয়ে এ প্রস্তাব শোনালে ওরা আমায় সেই চিরবিখ্যাত দেশটিতে চালান করে দিতে চাইবে। কী খবর আনলে। ধ্যুৎ !

হাসি আর থামতে চায় না পীযূষকান্তির।

কিন্তু বন্ধু নাছোড়বান্দা। সে প্রশ্ন করে রাজপুর সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কিনা পীযূষের।

শুনে পীযূষ একটু স্মৃতির দোলায় দোলায়িত হয়। সম্প্রতিকার কোনো ধারণা অবশ্য নেই, অতীতের আছে। রাজপুরে তার মায়ের মামার বাড়ি ছিল। অতি বাল্যে গিয়েছে মায়ের সঙ্গে। মায়ের মামার বাড়িতে দূর্গাপূজো হ'ত। মোটা মোটা থামওয়ালা ঠাকুরদালান। নীচের উঠোনে দাঁড়িয়ে পূজো দেখত গ্রামের সবলোকেরা, বাড়ির লোকরা দালানে বসে। ওই দালানে বসার জন্যে নিজেকে বেশ উঁচু উঁচু লাগত পীযূষের।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচ্ছা সেই বাড়িটা নয় তো ? মোটামোটা থামওয়ালা অনেক বাড়ি ছিল কি সেখানে ?

প্রশ্ন করল মালিকের নাম কি ?

অবশ্য নাম শুনলেই কি আর বুঝতে পারা যেত ? কে মনে রেখেছে মায়ের থেকে অনেক বড়ো সেই মামাদের নাম ?···তবু ভাবল শুনিতো।

কিন্তু বাড়িটা নাকি এখন কোনো সূত্রে এক বিধবা বুড়ির সম্পত্তি ···জ্ঞাতিগোত্ররা কে কোথায় আছে কে জানে, বুড়িই আছে ভিটে আগলে। কিন্তু আর একা থাকতে পারছে না, চলে যাবে বোনঝির না কার বাড়ি, তাই বাড়ি বেচার তাগিদ। আর তাগিদ যেখানে প্রবল, সেখানে জলের দর তো হবেই। বুড়ির নাম কে জানতে

গেছে। দলিলে দেখা যাবে। পীযূষের একবার কৌতূহল হ'ল—নাম শুনে বোঝা যাবে না গিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু বৃথা গিয়ে হবেই বা কি। যদি সেই বাড়িই হয়, পীযূষ কিনতে যাবে নাকি? পীযূষ কথাটাকে নস্যাৎ করল।

কিন্তু ওদিকে কানের কাছে সুধাময় সুধাবর্ষণ করেই চলেছে।

পীযূষের শৈশবের দেখা রাজপুর গ্রামের সঙ্গে এখনকার রাজপুরের তুলনাই চলে না, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলটি হয়ে পর্যন্ত যা ডেভেলাপ করেছে ওদিকটা ধারণা করা যায় না। রাস্তাটাস্তা চমৎকার। হবে না কেন, ওই পথ দিয়েই তো রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীমান্ত্রারা যাতায়াত করে থাকেন। নরেন্দ্রপুরে একবারও যাননি এমন কেষ্ট বিষ্টু কে আছে? ওদিকে গেলে স্বাস্থ্য টাস্থ্য ফিরে যাবে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সুধাধারা তেমন ভাবে কানের মধ্যে না নিলেও, মনের মধ্যে চলছিল স্মৃতির অনুরণন।···কী ভালোই লাগত মায়ের মামার বাড়ি যেতে। পীযূষদের বাড়ি ছিল ঝামাপুকুরে, নিজের মামার বাড়ি বাদুড়-বাগানে। 'প্রকৃতি' শব্দটার সঙ্গেই কোনো পরিচয় ছিল না। মায়ের মামার বাড়ি যেতে পেলে অগাধ উন্মুক্ত আকাশ বাতাসের স্বাদ মিলত। তার সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতারও।···কারণ—মায়ের মামার বাড়িতে বাবা যেত না কোনো বারই। মা যেত নিজের মা-বাবার সঙ্গে। আর মা তখন ছেলেমানুষ হয়ে যেত।

মনের মধ্যে হঠাৎ যে ঢেউটা উঠে পড়েছিল, তার ধাক্কায় পীযূষ বলে ফেলল, আচ্ছা চল না হয় একদিন দেখেই আসা যাক। জাস্ট দেখে আসা। ছেলেবেলার কথাটা মনে পড়ে গেল—

তারপর—

তারপর যা ছিল বিধাতার মনে।

* * * * *

নিরভিভাবক ওই নড়বড়ে বুড়িটা যে পীযূষের মায়ের মামার বাড়ির কেউ সেকথা অবশ্য মনে হ'ল না পীযূষের, বাড়িখানাও যে সেই বাড়িখানা তাও ঠিক করে বলা গেল না, তবু শৈশবের ভালো লাগার সূত্র ধরে এই মোটাথাম আর ঠাকুরদালানওয়ালা বাড়িটা যেন মনের মধ্যে খানিকটা জায়গা জবর দখল করে বসল।

তাছাড়া—লাখ দেড়েক টাকার সম্পত্তি যদি তুমি সত্তর পঁচাত্তর হাজারে পেয়ে যাও, ভেবে দেখবে না একবার ?

ভেবে দেখতে শুরু করল পীযূষ। একটা রবিবার সকালে রাজপুর ঘুরে আসার পর থেকে।....সেই ভেবে দেখাই কাল হ'ল।

অতীতের সেই কথাগুলো মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছে আজ। কী লড়াই চলেছিল স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু পীযূষ তখন প্রায় সুধাময়ের হাতের পুতুল। সুধাময়ের চোখেই পৃথিবী দেখছে তখন।

তাই পীযূষেরও মনে হয়েছিল নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধে ব্যাহত না করেও যদি মফস্বলের সুযোগ-সুবিধেগুলো আহরণ করা যায় তার চাইতে কাম্য আর কী আছে ?

তার সঙ্গে সুধাময় তো পরামর্শর চাষ চালিয়েই যাচ্ছে।

বাড়ি সংলগ্ন জমি যতখানি পড়ে আছে, তাতে ফুলের বাগানের জন্যে কিছু রেখেও বাকিটায় কিচেন গার্ডেন করতে পারলে, তরিতরকারি আর কিনে খেতে হবে না।...গোয়ালবাড়ি বলে যে দিকটা পড়ে আছে, একটু সারিয়ে নিয়ে দুটো গরু রাখলে খাঁটি দুধ খেতে পাওয়া যাবে, যে জিনিসটি শহরে একেবারে দুর্লভ।

তার মানে গাড়িয়াহাটের এক শৌখিন সভ্য ব্যক্তির হঠাৎ

চাষীবাসী গৃহস্থ বনে যাওয়া। এরপর হয়তো তুমি সুধাময় তোমার বন্ধুকে ধান জমি দেখাবে।

কিন্তু এ ব্যঙ্গ সুধাময়কে কাবু করবে নাকি? সুধাময় কি শুধুই পরোপকারী সুহৃৎ? পাকাপোক্ত একটি দালাল নয়?

যুক্তি নেই ওর?

শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে গাছ গাছালি বাগান টাগান সম্বলিত বাড়ি করা 'ওদেশের' ফ্যাশান নয়? ওদেশের সভ্য মার্জিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভাবতেই পারে না, শহরের ঘিঞ্জির মধ্যে বাড়ি বানানোর কথা। আর আদর্শ বলতে তো ওদেশেই।

যুক্তি, যুক্তি, যুক্তির জালে বাঁধা পড়ে গিয়ে পীযূষকান্তি বোস একটা মোটা অঙ্কের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে বসে আছে। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই কৃচ্ছ্রসাধন। এই আরামকে হারাম করা। বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে হয়েছিল আটাত্তর হাজারে। সুধাময় জোর দিয়ে বলেছিল, তবু বলব জলের দরে পেলে তুমি।

সুরমা আজ তাকে পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য কেনা বলে ঘোষণা করেছে। শুনে পর্যন্ত কথাটাকে মাথার মধ্যে থেকে তাড়াতে পারছে না পীযূষ। আলো ঝলমলে গড়িয়াহাটটাকে ছেড়ে চলে আসতে আজ তার গভীর নিশ্বাস পড়েছে। ইচ্ছে করে এই স্বর্গ হারিয়েছে পীযূষ। নিজেকে যেন পরাজিত পরাজিত বলে মনে হচ্ছে। যেন হঠাৎ একটা বেচারী মানুষ হয়ে গেছে পীযূষকান্তি বোস।

বাস থেকে নেমে মিনিট কয়েক হাঁটতে হয়। জ্যোৎস্না থাকলে এই হাঁটাটা খারাপ লাগে না। এক একদিন, মানে যেদিন জ্যোৎস্নাটা খুব মায়াময় হয়ে ওঠে, বরং হাঁটতেই খুব ভালো লাগে। মনে হয় এই প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে, কোথায় বুঝি কোনো গভীর রহস্যময় এক জগৎ আছে। যেখানে কারো উচ্চকণ্ঠের সাড়া ওঠে না, সবাই চুপি চুপি কথা বলে। জ্যোৎস্নাকে এমন নিথর হয়ে পড়ে থাকতে কখনো যেন দেখেনি পীযূষ। মনে হচ্ছে বুঝি একটা শান্ত জলাশয়।

গড়িয়াহাটের বাড়ির সেই বারান্দাতেও জ্যোৎস্না আসত, সরু এক ফালি আলোর ওড়না এসে বিছিয়ে পড়ত চিত্রবিচিত্র মোজেক মেঝের উপর, ভালো লাগত। কিন্তু বারান্দার ঠিক সামনা-সামনিই ছিল রাস্তার লাইটপোস্টটা। (অন্যফ্ল্যাটের বাসিন্দারা যা দেখে ঈর্ষা করত) সেই চড়া আলোর ঝলসানিতে জ্যোৎস্নার এই ছায়া ছায়া মায়া মায়া রূপটা খুঁজে পাওয়া যেত না লোডশেডিং অবস্থা ছাড়া।

কলকাতার আর কোথাও কি জ্যোৎস্না নেই। ময়দানে? ইডেন গার্ডেনে? লেকে? আছে বৈকি, প্রকৃতির একদেশদর্শিতা নেই। তার দানের পাত্র সে সর্বত্রই উপুড় করে ধরে। নেবার মন চাই। দেখার চোখ চাই।

পীযূষকান্তি বোসের কবে আর সে মন তৈরি হ'ল? কবে সে চোখ ছিল? তাকে ঝামাপুকুর থেকে গড়িয়াহাটে উঠে আসতে হয়েছে। তার জীবন হচ্ছে শুধু সেই পদক্ষেপ গোণা।

ভেবেছিল গড়িয়াহাটের ওই ফ্ল্যাটটাই তার লক্ষ্যমাত্রা, সেটাকে যথোপযুক্ত সাজিয়ে তোলা, আর আধুনিক ভদ্র জীবনে যা যা থাকা দরকার সেগুলো আহরণ করার পর আর কিছু করণীয় থাকবে না তার। ঘুম থেকে উঠছি, সুন্দর বাথরুমে স্নান করছি, শৌখিন টেবিলে বসে রুচি পছন্দমতো খাচ্ছি, অফিসের গাড়িতে চড়ে অফিস যাচ্ছি, টিফিনের সময় রোজ একবার করে বাড়িতে অকারণ টেলিফোন করছি, বাড়ি ফিরে পুত্রকন্যা নিয়ে পারিবারিক সুখের মৌজে ডুবে সোনালী সুখের গল্প করছি। আবার রাত্রে টেবিলে এসে বসছি, দিনে যেটা [illegible], সপরিবারে একসঙ্গে খেতে বসা, রাত্রে সে আনন্দটা উপভোগ [illegible]ছি, তারপর কাকজ্যোৎস্নার মতো মৃদু আলোটি জ্বালিয়ে ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে পড়ছি। এর অধিক আর কী চাইবার আছে? কী থাকে? কী থাকে পীযূষকান্তি বোস জানত না সেটা।

হঠাৎ ওই গাড়িটার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছিল। যেটা ছকে ছিলনা। কিন্তু সেটা বা এমন কি বেশী?

ওই ছন্দে গাঁথা দিনের মাঝখানে মাঝে মাঝে যেমন কিছু বই পড়া, কিছু ছবি দেখা, কিছু নাটক দেখা, কখনও কোথাও বেড়াতে যাওয়া, গাড়ির শখটাও এসেছিল তেমনি হালকা চালে।...

পীযূষকান্তি বোসের সেই ছন্দে গাঁথা স্বচ্ছন্দ জীবনের সামনে কোনো হিংস্র শব্দ ছিল না। যে শব্দটা নিয়ে এল পীযূষের বন্ধু।

সুধাময় প্রথম বিচলিত করিয়েছিল এই প্রশ্ন তুলে, মরা বাঁচার কথা তো বলা যায় না। পীযূষকান্তি বোস যদি হঠাৎ মারা যায়, তার স্ত্রীপুত্রের ভবিষ্যৎ কী? পাঁচশো টাকা ভাড়ার এই ফ্ল্যাটটার মালিক কি এত দয়াল্ যে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেবে তাদের? নাকি এই তেল কোম্পানীর কর্মকর্তারা এত হৃদয়বান হবে, যে তার একজন ম্যানেজার মারা গেলেও সেই ম্যানেজারের সংসারটাকে ম্যানেজ করবার দায়িত্ব নেবে তারা?

প্রশ্নটা এল হাতুড়ির মতো।

পীযূষকান্তি বোসের সেই সুন্দর করে সাজানো জীবনছন্দটি তছনছ হয়ে গেল তাতে।

আশ্চর্য! অথচ এখন আবার এটাকেই ছন্দ মনে হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ পীযূষকান্তি জ্যোৎস্না ঢালা মাঠকে নদী ভাবতে ভালবাসছে, দু' দণ্ড সেই নদীতীরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে ইচ্ছে করে ঢেউ উঠছে কি না।

আজও একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখল। সারাদিন ধরে যে শব্দটা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেই শব্দটা যেন হঠাৎ থেমে গেল, পীযূষকান্তি তার মোটা থামওয়ালা বাড়িটার কাছে চলে এল কেমন একটা ভালোবাসার মন নিয়ে।

মনে হ'ল যেন একটি মন্দিরে ঢুকতে এল।

এখানে দরজায় কলিংবেল নেই। তাই বাড়ির কর্তার বাড়ি ফেরার ঘোষণাটা তীক্ষ্ণ মধুর সাড়া তুলল না। উঠোনের ঘেরা প্রাচীরের গায়ে যে দরজাটা, যাকে সদর দরজা বলা হয়, সেটাকে বাইরে থেকে

খুলে ফেলা যায়। কাজেই কড়ানাড়া দিয়েও সাড়া তোলার দরকার হয় না। একহাতে চাপ দিয়ে আর একহাতে একটা কড়া ধরে টানতেই ভিতরের ছিটকিনিটা পড়ে গেল, পীযূষকান্তি বোস নিজের বাড়িতে এসে ঢুকল।

অবশ্য এই ছিটকিনি পড়ার সামান্য সাড়াটুকুও ভিতরে গিয়ে পৌঁছল। কারণ উৎকর্ণ হয়েই ছিল কেউ। বেরিয়ে এল সে। পীযূষকান্তি একটু চমকে তাকাল।

মনে হ'ল তাদের সেই ঝামাপুকুরের বাড়ির রান্নাঘর থেকে যেন বেরিয়ে এল সুরমা। এই মনে হওয়ার কারণটা নির্ণয় করতে গিয়ে দেখল সুরমার শাড়ি পরার ধরন। গড়িয়াহাটার ফ্ল্যাটে উঠে আসা পর্যন্ত শাড়ি পরার ধাঁচ বদলে ফেলেছিল সুরমা। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা যেমন ঘুরিয়ে শাড়ি পরে ছবি ছবি হয়ে বেড়াত, সুরমাও সেটা চট করে রপ্ত করে ফেলেছিল।

সুরমা ক্রমশঃ বাংলা সিনেমার থেকে হিন্দি আর ইংরেজি সিনেমা দেখায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিল, সুন্দর করে কথা বলতে শিখেছিল, অনেক শৌখিন শৌখিন রান্না শিখে ফেলেছিল।

নইলে পীযূষকান্তি বোস আগে কবে জেনেছিল 'কেক্' জিনিসটা বাড়িতে বানানো যায়, চপ ফ্রাই পুডিং কাস্টার্ড নিত্য খাদ্যের তালিকায় স্থান পায়?

সুরমার কর্মক্ষমতা আর তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার ক্ষমতা পীযূষকান্তিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।...

এখানে মানে এই মোটা থামওয়ালা বাড়িটায় আসার পর অবশ্য সুরমা আর তার সেই শৌখিন রান্নার পদগুলি দেখাতে পেরে উঠছে না, কারণ এখানে সুরমাকে নিত্য হাঁড়ি ঠেলার দায় পোহাতে হচ্ছে।

একাধারে ভৃত্য, পাচক, দারোয়ান, পিয়ন ইত্যাদি করে সর্ব-ভূমিকায় শোভমান 'অলক' নামক তরুণটিকে বহু সাধ্য সাধনাতেও এখানে আসতে রাজী করাতে পারেনি সুরমা।

সে অনায়াস অবহেলায় বলেছিল, পাগল হয়েছেন মাসিমা? ওখানে কে যাবে? আমি ভাবছিলাম সাহেব গাড়ি কিনলে আমি ড্রাইভারের কাজটা নিয়ে নেব, চালাতে শিখে ফেলতে ক'দিন? তা নয় সাহেব পচা পাড়াগাঁয়ে এক বাড়ি কিনে বাস করতে ছুটলেন! তারপর অবশ্য এ আশ্বাসও দিয়েছিল, সায়েবের ওই বিদঘুটে শখ দু' দিনেই মিটে যাবে, আবার এই বালিগঞ্জ এলাকাতেই ফিরে আসতে হবে। তখন অলকের খোঁজ করলেই চলে আসবে সে। মাসিমার স্নেহ-যত্ন তো ভোলবার নয়। হয়তো কথাটা মিথ্যে স্তুতি নয়, তা অলকের কর্মদক্ষতাও তো ভোলবার নয়। প্রতিপদেই তার অভাব অনুভব করতে হয়।....মেয়েরা এবং মা সর্বদা সেই হা হুতাশ করে করে ঘোষণা করেন এই প্রচণ্ড লোকসানটাও পীযূষকান্তির দুর্মতির ফল।

অলককে দেখে অন্য ফ্ল্যাটের সবাই হিংসে করত বুঝলে? অলককে রেখে পর্যন্ত একদিনের জন্যে এককাপ চা তৈরি করে খেতে হয়নি আমায়।···অলক যা ফাইন ইস্ত্রী করতে পারত, লণ্ড্রিকে হার মানায়। সব হল-এ হাউস ফুল, অলক আমাদের তিন তিনখানা টিকিট যোগাড় করে দিয়েছে। অলকের গুণ বলে ফুরোবার নয়।

অথচ সেই নিধিটি সুরমার জীবন থেকে ফুরিয়ে গেল।

সুরমার শূন্য হৃদয় হাহাকার করবে না?

পীযূষকান্তি অবশ্য মনে মনে ভেবেছে, ফুরিয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে। হিসেবী হয়ে ওঠার পর থেকে হিসেব করে দেখেছে যে অলকের পিছনে মাসে অন্তত দুশোখানি টাকা খরচ হ'ত। সত্তর টাকা মাইনেটা কিছু না, অলকের খাওয়া পরা, বাবুয়ানী, অলকের দরাজ হাতের অবিরত অপচয়, অলকের বাজার দোকান করে এসে বাকি পয়সা ফেরত না দেওয়া, অলকের মাসে দু' তিনটে সিনেমা দেখার খরচ, উচ্চমানের সেলুনে চুল কাটার ব্যয়ভার, সব মিলোলে, দুশোর বেশী বৈ কম হবে না।

তার ওপর আবার সুরমা অলককে পাড়াগাঁয়ে আনবার খেসারৎ স্বরূপ আরও দশটাকা মাইনে বেশী দিতেও প্রতিশ্রুত হচ্ছিল, অলকের পাষাণ হৃদয় গলাতে পারেনি।

একমাত্র টুকুই অলককে দু-চক্ষে দেখতে পারত না, মায়ের পুত্রাধিক প্রিয় এই মস্তান চাকরটি তার চক্ষুশূল ছিল। তাই সে রেগে রেগে বলেছিল, ওঃ পচা? পড়াগাঁ! কোন দেশ থেকে এসেছেন আপনি। বিলেত থেকে? না আমেরিকা থেকে?

এই প্রশ্নে অলক শুধু উত্তর দিয়েছিল, যে দেশ থেকে এসেছি সেটাই যদি বজায় থাকবে, তবে মা বাপ ছেড়ে এসেছি কেন দাদাবাবু?

এই উত্তরের পরই সুরমার হৃদয় বিদীর্ণ করে সামনের ফ্ল্যাটে কাজে লেগে গিয়েছিল অলক।

সুরমা ক্ষুব্ধ হয়ে সামনের গিন্নীকে বলেছিল, আর দুটো দিন আপনার সবুর সইল না মিসেস ভাদুড়ি? বাসা বদলের সময় এই অসুবিধেয় ফেলে চলে গেল ও?

মিসেস ভাদুড়ি অমায়িক গলায় বললেন, আমি তো সেকথা হাজারবার বললাম ওকে মিসেস বোস, তা ও-ই জেদ করে ঢুকল। বলল মাসের প্রথম—

সুরমা মিসেস ভাদুড়ির মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এই দরজাটি বন্ধ করা মানেই যে গড়িয়াহাটের ওই প্রিয় পরিচিত ফ্ল্যাটবাড়িটারই দরজাও জন্মের শোধ বন্ধ করে দেওয়া হ'ল, সে কথা তখন মনে পড়েনি সুরমার।

নীলু মাঝে মাঝে বলে তুমি এমন কাজটি করে এলে মা যে, ও পাড়ায় একবার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হলেও যাওয়া যায় না।

তবে বিলু ঠোঁট উল্টোয়, তোর আবার ও পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে ওদের মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে? রাজ্যহারা রাজার ভূমিকায়?

ওরা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে বলে? দুটো সহানুভূতির কথা বলবে বলে? বাবার দুর্মতি নিয়ে দুঃখ আর সমালোচনা করবে বলে?··· সেদিন ছোটমাসির বাড়ি গিয়েই আমার বেড়াতে যাবার বাসনা মিটে গেছে।

এসব কথার কিছু কিছু যে পীযূষের কানে এসে আছড়ায় না তা নয়। অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করে সে, ভাবে তিলকে তাল করা মেয়েদের স্বভাব, তবু এক এক সময় অবাক হয় বৈকি। ভাবে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়া করা ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজের বাড়ি করার পিছনে যে এত থাকতে পারে কে জানত!

কিন্তু আজ এই ছায়া ছায়া অন্ধকার দালানে সুরমাকে আটপৌরে ধাঁচে শাড়ি পরে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে পীযূষের মনটা মমতায় ভরে গেল, গভীর একটা অপরাধবোধ এল মনের মধ্যে।

এই সময় গড়িয়াহাটের বাড়ির সেই আলোকোজ্জ্বল বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকত সুরমা ছবি ছবি হয়ে, হাতে হয়তো কোনো একটা পশম বোনা, হয়তো কোনো সেলাই। অলক ট্রে করে চা নিয়ে আসত।

সুরমা মিষ্টি হেসে বলত, অলকের হাতে চা খেয়ে খেয়ে, নিজের তৈরী চা খাওয়ার কথা আমার ভাবতেই ইচ্ছে করে না।

সেই সুরমাকে এখন—

কিন্তু আমি তো ওর ভবিষ্যৎ ভেবেই করেছি। আমি যদি হঠাৎ মারা যেতাম, কী হ'ত সুরমার?···এখন আর আমার মরতে ভয় নেই।···কেউ তো ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। এ বাড়িটা না করে মরলে, সুরমাকে হয়তো আবার ঝামাপুকুরের বাড়ির সেই ঘরখানায় গিয়ে উঠতে হ'ত, যে ঘরটা আমি ছোট ভাইকে দান করে এসেছিলাম।

তার থেকে কী এটা খারাপ?

সুরমা, তুমি আমার বিচক্ষণতার ফল ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে। যখন আমি থাকব না।

এসব কথা অবশ্য মনে মনেই বলে পীযূষ। মুখে এক আধবার বলতে গিয়ে ঝঙ্কার খেয়েছে। কে আগে মরবে, সেটা পীযূষ যমরাজের কাছ থেকে জেনে এসেছে কিনা, সেই কূট প্রশ্নটি করেছে সুরমা।

তাই পীযূষ মনে মনে বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ সাবেক কালের মতো সাজ করে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে—

পীযূষের কণ্ঠে ভালোবাসা ছিল, মমতা ছিল, অন্তরঙ্গতার মাধুর্য ছিল, তবু সুরমার কাছ থেকে একটা বেজার গলার উত্তর এল, সাবেক কালের মতন যখন ঘুঁটে কয়লার ধোঁয়া খেয়ে উনুনে বাতাস ঠেঙিয়ে রান্নাই সার হ'ল তখন সেই সাজই ভালো।

পীযূষ শুনেছিল এখানে সুরমার সেই সিলিণ্ডার গ্যাসের উনুন জোড়াটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, গ্যাস সাপ্লাইয়ের অভাবে, কিন্তু তার জন্যে সুরমাকে যে সাজ বদলাতে হবে এমন কথা শোনেনি। কিন্তু শুধুই কি সাজবদল ?

পীযূষের আজ ওই পাষাণ কঠিন মুখ, ধাতবকণ্ঠ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল, পুরো মানুষটাই বদলে গেছে। সেই সুরমাকে বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।···অথচ পীযূষ ভেবে এসেছে দাঁতে দাঁত চেপে তিন তিনটে বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।··ধার শোধ হয়ে গেলে আর কী দায় থাকবে পীযূষকান্তি বোসের ? ততদিন তো কর্মক্ষেত্রেও উন্নতির সীমারেখায় পৌঁছবে।

'ভবিষ্যৎ'কে বাঁধিয়ে ফেলে নিশ্চিন্তচিত্ত পীযূষকান্তি তখন আবার যত্র আয় তত্র ব্যয়ের উদার ভঙ্গিতে সংসার করবে, ছেলেমেয়েদের সব অভাব পূরণ করবে, সুরমাকে আরামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অলক ছাড়া অলকের মতো কোনো লোক পৃথিবীতে না জোটে, সেই অলককেই ধরে এনে দেবে সুরমার পায়ের কাছে। টাকায় কিনা হয়? সত্তরের জায়গায় একশো সত্তর পেলে সে দক্ষিণদিকে এই বাড়টুকু বাড়াতে রাজী হবে না? সব তুমি আবার ফিরে পাবে সুরমা, তার সঙ্গে রয়ে যাবে জমিদার বাড়ির মতো এই বাড়িটা। খোলামেলা এতখানি জমি।···কলকাতায় কি তুমি একছটাক জমিওয়ালা বাড়িও পেতে? ধর যদি তুমি একটা দশতলা বাড়ির একখানা ফ্ল্যাট কখনো কিনতে, পায়ের তলায় মাটি থাকত তোমার?

এসবই পীযূষ মনে মনে বলে, উচ্চারণ করে বলতে পায় না। সুরমা সেটুকু এগোতেই দেয় না।

আর ছেলে-মেয়েরা?

তারা তো 'সাপ' হয়ে বসে আছে।

তবু পীযূষই সেই দিনটার স্বপ্ন দেখছিল, যেদিন নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার ওরা 'পান্না-চূণী-হীরে' হয়ে যাবে। এতদিন তাই ভেবে এসেছে।

আজই প্রথম পীযূষের মনে হ'ল সে খুব একটা ভুল করেছে, খুব একটা দোষ করেছে।

আস্তে বলল, বাড়িটা এত চুপচাপ যে? ওরা কেউ বাড়ি নেই?

সুরমার তীক্ষ্ণস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে পড়ছ যে! কবে আবার ওরা সন্ধেবেলা বাড়ি বসে থাকে?

কথাটা বলে ফেলেই এর উত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল পীযূষ, তাই তাড়াতাড়ি বলল, আজ আর সন্ধে নেই, বেশ রাত হয়ে গেছে।

এর থেকে আরো অনেক রাত করে ফেরে ওরা!

সংক্ষেপে এই কথাটুকু বলে সুরমা ভিতরে চলে গেল, বোধহয় চা বানাতে।

পীযূষ বোকার মতো মুখে হাত-মুখ ধুতে গেল।

সত্যি রোজই তো সে বাড়ি ফিরে একা একা চা খায়, একা বসে থাকে চুপচাপ,

হয়তো সকালে না-পড়া খবরের কাগজখানা ওলটায়।

কতক্ষণ পরে যেন ফেরে ছেলেমেয়েরা একে একে। নীলু গোলপার্কে কালচার ইনস্টিটিউটে স্পোকন ইংলিশ শিখতে যায়। বুলু কলেজের পর কোন প্রফেসরের বাড়ি পড়তে যায়, তিনি যেদিন যতক্ষণ ইচ্ছে পড়ান। অতএব ফেরার স্থিরতা নেই। টুটুর কথা বাদ দাও, সে সোজা জবাব দিয়ে দিয়েছে, তোমাদের এই রাজা রাজড়াপুরের বাইরে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণই মঙ্গল। নেহাত না ফিরলে নয় তাই ফিরি।

চা নিয়ে এল সুরমা, সঙ্গে শৌখিন কিছু নয়, শুধু একটু চিঁড়ে ভাজা। পীযূষের নাকি আজকাল এইটাই সবচেয়ে ভলো লাগে।

শুনে বুলু মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলেছিল, বাপীর আজকাল টেস্টটা খুব হাই হয়ে গেছে।

প্রতি কথাতেই তো এখন ওরা বাপকে না ঠুকে কথা বলে না, পীযূষ গায়ে মাখে না, পীযূষ শুধু আবার দিন ফেরার দিন গোণে।

সুরমা যখন চা-টা এগিয়ে দিল, পীযূষের চোখে পড়ল সুরমা আগের থেকে অনেক ময়লা হয়ে গেছে, সুরমার মুখের রেখায় এই একটা বছরেই যেন অনেকগুলো বছরের পদচিহ্ন।

কিন্তু পীযূষকান্তি বোস পয়সা খরচ করে শুধু দারিদ্র্যই কেনেনি, অনেকগুলো অধিকারও হারিয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মমতা প্রকাশের অধিকার। সুরমার কষ্ট দেখে সহানুভূতির মন নিয়ে কিছু বলতে গেলেই সুরমাও সাপ হয়ে যায়। সুরমা তীব্র ব্যঙ্গে ফোঁস করে ওঠে।

তাই মমতাকে বাক্সে বন্ধ করে পীযূষকান্তি শুধু বলল, তোমার চা?

আমার এখন কাজ রয়েছে, ওরা এলে খাব।

সুরমার কথাবার্তা আজকাল কী কাটাছাঁটা সংক্ষিপ্ত।

পীযূষ তবু ভুল করে বসে, যা প্রকাশের অধিকার হারিয়েছে তাই প্রকাশ করে বসে। বলে ফেলে—তা একা হাতে এত সব রুটি ফুটি না করে, ভাত রাঁধলেও তো হয়। মেয়েদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য যখন পাচ্ছ না।

দাঁড়িয়ে একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, ওইটুকুই বাকি আছে।··· মেয়েদের এবার বলি তোরা সব ঘুচিয়ে এঁদোপড়া রান্নাঘরে বসে মশলা পেষ, রুটি ব্যাল।

সুরমার উক্তিতে অবশ্য কিছু অত্যুক্তি আছে। রান্নাঘর মোটেই এঁদোপড়া নয়, ওদের আগের বাড়ির শোবার ঘরের মাপের একটা ঘর রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ বাড়িটায় ঘর আছে অনেকগুলো।

তাছাড়া কেনার পর অনেক টাকা খরচা করে বাড়িটাকে যতটা সম্ভব আধুনিক করে নেওয়াও হয়েছে। কিন্তু সুরমার আজকাল প্রায় সব কথাতেই অত্যুক্তিদোষ থাকে। সব সময়ই সয়ে যায় পীযূষকান্তি। কিন্তু আজ হঠাৎ একটা কথা বলে বসে। বলে, এই প্রাসাদের মতো বাড়ি, এ তোমার কাছে এঁদোপড়া হ'ল?

প্রাসাদের মতো!

সুরমা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, প্রাসাদের মতো বলেই বোধ হয় বরদাস্ত হচ্ছে না, গরীবের মেয়ে তো! প্রাসাদের বদলে একটু মানুষের বাসযোগ্য জায়গায় দু'খানা ঘরের একখানা কুঁড়ে পেলেই বর্তে যেতাম।

এরপর আর কি বলতে পারে পীযূষ, আর কি বলবার আছে? মনের মধ্যে যে সব কথা ঝনঝনিয়ে বাজে, সে কথা কি বাইরে বলা যায়? বলা গেলে তো বলে উঠতেই পারত—সুরমা, তোমার স্বামীর যদি বদলীর চাকরী হ'ত? আর কাঁহাকাঁহা মুলুকে বদলী

হতে হ'ত তাকে! তুমি যেতে না তার সঙ্গে? স্বামীর সঙ্গে তো সুন্দরবনেও যেতে হয় কত মেয়েকে, উড়িষ্যার জঙ্গলে। হিমালয় থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত যে কোনো জায়গায়। সেই সমস্ত জায়গা গড়িয়াহাটের মোড়ের মতো?

বলতে পারে না, তাই সুরমাই আবার বলে, রাত্রিতে ভাত! খাবে কী দিয়ে? মাছ যা আসে তাতে তো দু'বেলার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি হয়তো এখন সবই পারবে, শুধু শাক পাত দিয়েই খেতে পারবে, ওদের পারতে সময় লাগবে।

যখন তখনই একথা বলে সুরমা, 'পারতে সময় লাগবে।'

শুনতে শুনতে হঠাৎ কোনো সময় বলে উঠতে ইচ্ছে করে পীযূষকান্তির, কিন্তু ঝামাপুকুরের সাবেকি বাড়ির প্যাটার্ণ থেকে বালিগঞ্জের ছাঁচে ঢালাই হতে তো 'সময় লাগেনি' তোমাদের।...

দু'দিনে শাড়ি পরার স্টাইল বদলে ফেলতে পেরেছিলে, পেরেছিলে সর্বদা চটি পরে থাকতে, ব্লাউসের হাতা ছাটাই করতে। ...যে তোমাকে সকাল বেলা স্নান করে তবে রান্নাঘরে ঢুকতে হ'ত, সেই তুমি কত চট করে 'বেড টী' খেতে শিখে ফেলতে পেরেছিলে।...

অনেক কিছুই তো বদলে ফেলেছিলে সুরমা চটপট।...অবশ্য পীযূষকান্তিরও যে ওই বদলগুলো খুব খারাপ লাগত তা নয়. মাঝে মাঝে সাবেকি সেই সংসারটার জন্যে আর তার সদস্যদের জন্যে মন কেমন করলেও, মোটামুটি ভালোই লেগেছে।

আর ওই ভালো লাগাটার সঙ্গে সঙ্গেই অবাক অবাক লেগেছে সুরমার এই পটুতায়। সুরমাও তো ওই উত্তরেরই মেয়ে, যে উত্তরে না কি বাতাস বয়না।

বরানগরে বাপের বাড়ি সুরমার।

কিন্তু মা বাপ না থাকায় সে কথাটা কবেই ভুলে মেরে দিয়েছিল সুরমা।...সুরমাকে দেখে মনে হ'ত সে যেন জন্মবধি এই বালিগঞ্জের

জীবনেই অভ্যস্ত।....এটা পারতে যদি তোমার একটুও 'সময়' না লেগে থাকে সুরমা, তা'হলে আর একবারটি ওই পুরণো অভ্যাসের খাঁজে পা বসাতে এত সময় লাগার প্রশ্ন কেন? ঘুঁটে কয়লা কি তুমি এই রাজপুরে এসেই প্রথম দেখলে?

এসব কথা মনে এলেও মুখ ফুটে বলার সাহস হয় না পীযূষ কান্তির। কারণ সংসারে পীযূষকান্তির ভূমিকা এখন কাঠগড়ার আসামীর। বিচারক পক্ষকে সওয়াল করবার অধিকার কোথায় তার?

সর্বস্বান্ত হয়ে এই অনধিকারীর ভূমিকাটি কিনেছে পীযূষকান্তি।

অতএব চুপচাপ সব মেনেই নিয়ে চলে, এবং কেমনকরে যেন ধীরে ধীরে নিজেকে সেই পুরনো অভ্যাসের খাঁজে বসিয়ে ফেলতে থাকে।

অসুবিধের মধ্যে – তখন এত অনটন ছিল না। একান্নবর্তী বড়ো সংসারে পীযূষকান্তিই ছিল 'কল্পতরু'। যখন যা কিছু বাড়তি খরচ পড়বে, সংসারের সবাই জানে, ওটা পীযূষকান্তির দায়। পীযূষকান্তি নিজেও তাই জানত।...আর সুরমা ওই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে—হেসে ঠাট্টা করে ব্যাপারটাকে লঘু করে ফেলেছে।

....

তখন পীযূষকান্তি সকাল হলেই থলি হাতে বাজারে ছুটত, মাঝে মাঝে ধুতিও পরত। তবে গড়িয়াহাটের পাড়ায় আসার পর অবশ্য সুরমা আর ধুতি পরতে দেয়নি।

যদি বা পরেছে কদাচ, পাট করে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে।

ওটাতে নাকি কিছুটা আভিজাত্য আছে। অবশ্য সিল্কের লুঙ্গি হলেই সবথেকে ভালো, ওতে আভিজাত্যও আছে, সুবিধেও আছে। কিন্তু ওটা কিছুতেই বরকে পরাতে ধরাতে পারেনি সুরমা। ঘন গাঢ় রঙের ওই সিল্কের লুঙ্গিগুলোয় কত সুবিধে তা বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রাণ

হয়েও না। নরম, হালকা, ময়লা হওয়া বোঝা যায় না, কত সুবিধে দেখ—

সুবিধে!

সুবিধে!

ওটাইতো জীবনের মূল মন্ত্র। সুবিধের জন্য কত কীই করতে হয়। ছাড়তে ছাড়তে আর ধরতে ধরতেই জীবনের পথে এগিয়ে চলা।

তবে কিছু কিছু লোক এখনো আগেকার মতো বোকা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরনো খুঁটি ধরে পুঁতে বসে থাকতে চায়। পীযূষকান্তিও এক হিসেবে বোকাই। অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ওই লুঙ্গি, কি যে এক কুসংস্কার। না কি ওঁর মা বলতেন, ওইগুলো পরে বেড়ালে হিঁদুর ছেলে বলে মনে হয় না! কাছা-খোলা বেটাছেলে তো একটা নিন্দের কথা।

এইটা একটা আজীবন আঁকড়ে ধরে থাকবার মতো কথা হ'ল?

অথচ পীযূষকান্তি আছে তাই ধরে। বাড়িতে পায়জামাটাই চালু রেখেছে। যদিও এখন আর তাতে তেমন জৌলুস দেখা যায় না। ভাঁজভাঙা আধময়লা আরো এক সেকেলেপনা আছে, পীযূষকান্তির যা দেখে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হাসে। অফিস যাবার প্রাক্কালে একটা শূন্য দেওয়ালের দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ চোখবুজে দাঁড়িয়ে থেকে তবে নামা। কারণটা কী? ঠাকুর দেবতার ছবি ফবিও তো নেই। ভগ্যিস নেই! তা হ'লে ঘরের কী চেহারাই খুলত! একেবারে গাঁইয়া বাড়ির মতো লাগত।

কিন্তু নেই তো!

তবে?

বহু চেষ্টায় বুলু একদিন 'বাপীকে' পেড়ে ফেলে ওই 'তবে'র উত্তরটা আদায় করে ফেলেছিল। চোখ বুজে ধ্যানের মতো ভাবনার মধ্য দিয়ে নাকি পীযূষকান্তি তাদের সাবেকী বাড়ির ঠাকুর ঘরের দেওয়ালটা

দেখতে পায়, যেখানে কালী-দুর্গা-নারায়ণের ছবি ঝোলানো আছে, আর তার নীচেয় পীযূষকান্তির মা বাবা দাদু ঠাকুমার ছবি।

চোখ বুজলেই সে সব দেখতে পাও তুমি ?

পাইই তো।

অফিস যাবার সময় ওই অত সবাইকে নমস্কার করে করে যাও ?

নমস্কার নয় প্রণাম !

নমস্কার নয় প্রণাম !

হি হি হি।

এটা বুলুর কাছে একটা হাসির খোরাক হয়েছিল।

নমস্কার নয় প্রণাম ! এমন সিরিয়াস মুখকরে বলল বাপী ! উঃ !

ও বাড়িতে বড়োদের সম্বন্ধে 'করলেন বললেন' বলার নিয়ম ছিল, বুলুরা সেই সেকেলে নিয়মটা ভেঙেছে। ওদের মতে ওটায় নাকি পর পর লাগে।

বাপীকে মাকে কি আমরা 'আপনি' বলি ? তাই 'করেছেন খেয়েছেন বলেছেন,' এই সব বলব ?

এই যুক্তির দ্বারা ও ওর দাদা দিদির অভ্যাসও ভালো করে ফেলেছে। অতএব বুলু এঘরে এসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল। এমন সিরিয়াস মুখ করে বলল বাপী।

এতে সুরমা একটু বকেছিল, তা ও কথা নিয়ে এত হাসির কী আছে ?

বুলু আরো হেসেছিল, কথার জন্যে নয়, কথার জন্যে নয়, বাপীর বলার ভঙ্গী দেখে। উঃ ! বাপীকে না, কোনো কিছুতে 'সিরিয়াস' দেখলে এত হাসি পায় !

সুরমা বলেছিল, আচ্ছা থাম ! ওর সামনে গিয়ে যেন হি হি করতে যাসনে।

তা তখন তো সুরমাকে পীযূষকান্তি এই জঙ্গলে এনে ফেলেনি। তখন সুরমা কোনো কোনো বিষয় ক্ষ্যামা ঘেন্না করত পীযূষ-কান্তিকে। মমতা বশতই করত।....এখন সুরমার অ্যাটিটিউডও আলাদা।

সুরমা নিজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চলে যায়, পীযূষ চুপচাপ বসে থাকে টেবিলের ধারে।

ঢাকা দালানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় খাবার টেবিলটা পাতা হয়েছে, তাকে ঘিরে খান পাঁচ-ছয় চেয়ার, সুন্দর সুদৃশ্য, কিন্তু এই টানা লম্বা দালানের পটভূমিতে কী অকিঞ্চিৎকরই লাগছে দৃশ্যটা।...এই টেবিলটাকেই ও বাড়িতে কত বড়োসড়ো মনে হ'ত!

দালানটার জায়গায় জায়গায় এক একটা লাইট ঝোলানো হয়েছে, তবু সবটা আলোকিত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই খানিকটা খানিকটা ছায়া ছায়া।

এই ছায়া ছায়া দালানে একা বসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় পীযূষের।

টেবিলটা কেনা পর্যন্ত ফুলটুসিদের আর কোনোদিন আসতে বা থাকতে বলা যায়নি। কি করে বলা যাবে? ফুলটুসি মানেই তো তার ছয় ছেলেমেয়ে, প্লাস বর। সর্বসাকুল্যে আটজন। টেবিলে ধরানো যায় না। এসে দু'দিন থাক বলাই বা যায় কোন সাহসে? জায়গা কোথায়? ফ্ল্যাট বাড়ির কারবার নিক্তিমাপা।

অথচ কি ভালোই বাসত ফুলটুসি রাঙাদাদের বাড়িতে আসতে! ঝামাপুকুরের বাড়িতে কত এসেছে, থেকেছে। মামাতো বোন হলেও নিজের বোনের মতো, ছেলেবেলাটা তো প্রায় ওই বাড়িতেই কেটেছে তার।

পীযূষের মা বেঁচে থাকতে মা-মরা ভাইঝিটাকে অধিকাংশ সময় নিজের কাছেই এনে রাখতেন। ফুলটুসি জানত তার দাদার বাড়ি।

তবু অধিক প্রত্যাশাটা ছিল তার রাঙাদার কাছে। কারণ বরাবরই অন্য ভাইয়ের থেকে পীযূষকান্তির উপার্জন বেশী। অতএব বোনেদের আনা নেওয়ার ব্যাপারে তার অবদানই বেশী, বিশেষ করে ফুলটুসি একটু বিশেষ প্রিয় ছিল। বিয়ের পর থেকে শুধু বরটিকে নিয়ে এবং একে একে ক্রমশ ছ' ছ'টি শাবককে নিয়ে অবলীলায় চলে এসেছে সে। অদ্ভুত খোলামেলা মেয়ে। অদ্ভুত সরল।

এসেই সব ক'টা ছেলেমেয়েকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে হি হি করে বেড়িয়েছে, তাস খেলেছে, থিয়েটার দেখতে যাবার ধুয়োতুলে বাড়ির দু'চার জনকেও অন্তত টেনে বার করে চলে গিয়েছে থিয়েটার দেখতে, রাত্রে এক একজন বৌদির ঘরে দু' একটা ছেলেমেয়েকে চালান করে দিয়ে নিজে যেখানে সেখানে শুয়ে পড়েছে। বরকেও বলত শালাদের রান্না-ভাঁড়ার ঘরের আনাচে কানাচে কোথাও একটু জায়গা জুটিয়ে শুয়ে পড় না। এই রাত্তিরে কেন আর ট্রাম বাস ঠেলে বাড়ি যাবে?

বর অবশ্যি থাকত না।

হেসে একটু ঠাট্টার জবাব দিয়ে চলেই যেত। বলত দু' একটা রাত শান্তিতে ঘুমিয়ে বাঁচি।

ফুলটুসি বরকে অকৃতজ্ঞ বলে গাল পাড়ত বৌদিদের শুনিয়ে শুনিয়ে। আর ফিরে যাবার সময় বলে যেত, রাঙাদা তুমি মনে করে আন তাই, না হ'লে আর আসা হ'ত? ও আনত নাকি?

কিন্তু রাঙাদা তো নিজের আনন্দেই আনত। ফুলটুসি যে দুটো চারটে দিন থাকত, বাড়িটা যেন খুশির হাওয়ায় ঝলমল করত।

গড়িয়াহাটের ফ্ল্যাটে চলে আসার পর পরিস্থিতির বদল হ'ল।

এ ফ্ল্যাটে তো আর ঝামাপুকুরের বাড়ির মতো মাটিতে ঢালা বিছানা পেতে শোয়ার কথা ভাবা যায় না, আসার সঙ্গে সঙ্গেই

জনে জনে খাট কিনতে হয়েছে, ঠিক মাপে মাপে।—টেবিলও মাপা। বড়োজোর একজন অতিথিকে ধরানো যায়।

অতএব ছ-ছটা শাবক সম্বলিত বোন-ভগ্নিপতিকে ডেকে এনে 'খাও শোও' বলে আপ্যায়ন করার কথা ভাবা যায় না।

তাছাড়া সে আহ্লাদ করতে চাইলেই বা সুরমা রাজী হবে কেন? পুরনো বাড়িতে সে ছিল ছোট বৌ, মাথার-ওপর তিন তিনটে জা, সংসারে কে এল গেল তার দায়িত্ব সুরমার নয়। সুরমার বরই বেশী খরচপত্র করে, অতএব দায়িত্ব আরো হ্রাস।

নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আরো একটা বাড়তিকে মশারির মধ্যে নিতে সম্মত হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট উদারতা। সেইটুকু সে করছে। অথবা ফুলটুসির ঢালাও আবদারে হতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এই ফ্ল্যাটবাড়িতে সে উদারতার প্রশ্ন ওঠে না। তিন ছেলেমেয়ের তিনটে সিঙ্গল খাট, নিজেদের মাপাজোপা ডবল বেড। এর মধ্যে কি আর একটা আলপিনও ঢোকানো যায়?

এক আধদিন ওদের খেতে বললেও হয়, প্রথম প্রথম এ ইচ্ছে প্রকাশ করতেও চেষ্টা করেছিল পীযূষ, কিন্তু কোথায় খেতে দেওয়া হবে অতগুলো লোককে, এই প্রশ্নে সে ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হয়েছে পীযূষকে। টেবিলের নীচে এমন জায়গা নেই যে আসনপীড়ি পাতা যায়। গেলেও সেটা দেখতে কী অড হবে ভেবে দেখতে বলেছিল সুরমা, পীযূষ ভেবে দেখে চুপ করে গেছে।

* * * *

এ পাশের দেওয়ালে আলোটা ঝুলছে।

ও দেওয়ালের গায়ে একটা ছায়া পড়েছে। চেয়ারে বসা পীযূষকান্তির পুরো অবয়বের।—সেই ছায়ার পীযূষের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে নিরুচ্চারে বলে চলে পীযূষকান্তি, তার মানে—পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য তুমি আজকেই কেনোনি হে পীযূষকান্তি বোস। অনেক দিন আগেই কিনেছ। তোমার কিছু অভাবের জন্যই তো তুমি তোমার প্রাণের খুব গভীরের ইচ্ছাটিকে পূরণ করতে পারনি ; বল ? আর সেই 'অভাব'টি তুমি পয়সা দিয়ে কিনেছিলে। 'অভাব' মানেই তো 'দারিদ্র্য' তাই নয় কি ?

তুমি তোমার সেই অদৃশ্য দারিদ্র্যের ভারে পীড়িত মনটা নিয়ে তোমার একান্ত স্নেহের পাত্র সেই আহ্লাদী ছোট বোনটার ছেলে-মেয়ের নাম করে অনেক খাবার-দাবার কিনে নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছ বোকাটে হাসি হেসে, আর তোমার বোন যখন হৈ চৈ করে আহ্লাদের ঢেউ তুলে বরকে ডেকে ঝঙ্কার দিয়েছে, দেখছ আমার ভাইয়ের টান ? আর তুমি এমন আলসে কুঁড়ে যে বলে বলে হদ্দ হলাম, একবার রাঙাদার নতুন সংসারটা দেখিয়ে আন, তা আর এ পর্যন্ত পেরে উঠলে না, তখন তুমি বলে উঠতে পারনি, ঠিক আছে, পরের ছেলের খোসামোদের দরকার নেই, আমিই নিয়ে যাচ্ছি চল।

না, তা তুমি বলতে পারনি পীযূষ বোস। প্রায় মুখের বাইরে বেরিয়ে আসা কথাটাকে ফের গলার মধ্যে চালান করে ফেলে, তুমি ঘটা করে পুরুষের কর্মজীবনের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তোমার ছোট-বোনকে অবহিত করতে বসেছ। অর্থাৎ তুমি তার বরের সমর্থনেই যুক্তি খাড়া করেছ। এটা ওটা সেটা···নানা প্রসঙ্গ তুলে ওই রাঙাদার নতুন সংসারের প্রসঙ্গটা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছ।

নিজেকে কি তখন তোমার খুব গরীব গরীব দীনহীন মনে হয়নি পীযূষবাবু? তেলঅফিসের হোমরা চোমরা বোস সাহেব।

শুধু জায়গার অভাবেই নয় পীযূষ, তোমার তখন সাহসেরও অভাব। ঝামাপুকুরের সংসারে তুমি দুম করে একটা ভার চাপিয়ে দিতে পারতে, অসময়ে একরাশ তপসে মাছ কি একগাদা চিঙড়ি কিংবা ইলিশের জোড়া এনে নামিয়ে দিয়ে ঘোষনা করতে পারতে —ফুলটুসিদের বলে এলাম।

বলতে তোমার বুক কাঁপত না। কিন্তু গড়িয়াহাটে এসে তোমার বুকের সেই বল কমে গিয়েছিল। কারণ এখানে তোমার কোনো পৃষ্ঠবল নেই। ওখানে তিনবৌদি উদারতায় টেক্কা দিতে তোমার সহায় হয়েছে, তোমার আনা মাছ দেখে ধন্যি ধন্যি করেছে। কারণ তুমি তো সকলের জন্যেই এনেছ। বাড়িতে উপছে পড়া মাপে। এখানে সব ব্যাপারেই তুমি সুরমার প্রজা হয়ে পড়েছিলে। রাজার ইচ্ছেই সব। এটাও তো তোমার পয়সা দিয়ে কেনা পীযূষ।...আবার পরে ক্রমশঃ তুমি যখন জানতে পেরেছ ফুলটুসির ঝামাপুকুরের দাদারা ফুলটুসির ভাইয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন আসা বজায় রেখেছে, তখনও কি তোমার নিজেকে একটা অভাবী অভাবী পরাজিত পরাজিত মনে হয়নি? হয়তো ফুলটুসির প্রকৃতিগুনেই ওই বজায়টা থেকেছে। তবু থেকেছে তো?

আর সুরমা যখন হেসে হেসে বলেছে, তোমার মেজদার বাজার করাতো? বোন-ভগ্নিপতির ভাগ্যে কুচো চিঙড়ির চচ্চড়ি আর চারাপোনার ঝোলের উর্ধ্বে আর কিছু জোটে বলে মনে হয় না, তখন যে তুমি তার একটা উচিতমতো উত্তর দিয়ে উঠতে পারনি, সেটাই বা কী? দারিদ্র্য নয়?

তারপর অবশ্য ক্রমশঃ নিজেই তুমি মুক্ত পুরুষ হয়ে গেছ, তোমার নিখিল বিশ্ব একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে ঠেকেছে। তাই যখন শুনেছ তোমার বড়দা রিটায়ার করে অবধি খুব অসুবিধেয় রয়েছেন, কারণ

ঠিক তখনই তাঁর ছেলেদের পরীক্ষার ফী আর মেয়ের বিয়ের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন তুমি ভয়ে ঝামাপুকুরের ছায়া মাড়াতে যাওনি। যেহেতু তুমি তখন তোমার ওই সুন্দর ফ্রীজটা কিনে বসেছ ইনস্টলমেণ্টে।

তা ইনস্টলমেণ্টে তো তুমি অনেক কিছুই কিনেছ পীযূষ বোস। তাই না? ওই রেকর্ড চেঞ্জারটা, ছোটমেয়ের হারমোনিয়ামটা, গিন্নীর শখের টেবিল কলটা (যেটা পরে আর ছুঁয়েও দেখা হয়নি, দরকারী সব কিছুই দরজির কাছে অর্ডার গেছে, মায় বালিশের ওয়াড় লেপের ওয়াড় পর্যন্ত) সোফা সেটগুলো, এমন কি তোমার নিজের শখের ডানলোপিলোর গদিটা পর্যন্ত।···ইনস্টলমেণ্ট মানে কী? ধারে কেনা বললে ভুল হয়? ধারই তো, মাসে মাসে কি দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক হারে তুমি সে ধার শোধ করেছ।···সত্যি বটে তাতে তোমার এখনকার মতো সব কিছুতে টান পড়েনি, তুমি দাঁড় বেয়ে নৌকা চালানোর মতো এগিয়ে গিয়েছ তরতরিয়ে।—এখন সেটা হচ্ছে না, কারণ এখন ধারের বোঝাটা অনেক বেশী। কিন্তু তার আরও একটা কারণ—তুমি চাইছ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেই বোঝাটা হালকা করে ফেলে, আবার নৌকাকে তরতরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অথচ এখন যখন তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য কিনছ বলে, তুমি আত্মধিক্কারে ম্লান হচ্ছ। এই আত্মধিক্কারটা তোমার ঝামাপুকুরের ছায়া মাড়ানো বন্ধ হওয়ায় হয়নি। তার মানে—তুমি ততদিনে রীতিমতো গরীব হয়ে গেছ।

ছায়াটা হঠাৎ নড়ে উঠল।

পীযূষকান্তি চমকে উঠল।

তারপর টের পেল সে নিজেই নড়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। ছায়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওঃ তোমার ছেলেকে তুমি বাড়িতে ঢুকতে দেখলে তাই নড়ে উঠলে।

কী আশ্চর্য, নড়ে উঠে তুমি আবার বসে পড়লে কেন পীযূষ বোস? ছেলেকে সম্ভাষণ করতে ছুটলে না? নিদেন পক্ষে রাত করে ফেরার জন্যে বকতে?···

পীযূষকান্তি আবার ছায়াটার উদ্দেশ্যে কথা বলল, বুঝেছি, ছুটে গিয়ে সম্ভাষণ করবে, এমন উছলে ওঠা পিতৃস্নেহ তোমার মধ্যে আর নেই, আবার দেরীর জন্যে বকতে যাবে, অভিভাবক জনোচিত সে সাহসও আর নেই। জান বকতে গেলেই তার থেকে অনেক বেশী কঠিন কথা তোমায় শুনতে হবে।

অতএব চুপ করে বসে শোন ওরা মায়ে ছেলেয় কী কথা বলছে।

ছেলে বলল, কী ব্যাপার জননী। এমন অশোকবনে সীতার মতো মুখ নিয়ে একা বসে যে?

টুটুর অবশ্য এটা নতুন নয়, বরাবরই ওর কথা বলার ধরন এই রকম। সুরমা বলেছে স্কুলের ছেলেদের কাছ থেকে শিখেছে।

নীলু বলেছে ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে তোমার ছেলের কাছ থেকে শিখতে পারে মা। ইয়ার নম্বর ওয়ান তোমার ছেলেটি।

মা এখন বিরক্ত গলায় বলে, মায়ের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক, না?

টুটু বলে উঠল, গডেস কালীর দিব্যি মা, ঠাট্টা করিনি, তোমায় দেখেই আমার ওই ছবিটার কথা মনে এল। তবে একটা জিনিসের অভাব দেখছি। চেড়ি দুটি কোথায়? এখনো চরে ফেরেননি নাকি?

মা আরো বেজার গলায় বলে, তুই আর বাকতাল্লা মারিসনে। নিজে আজ সকাল সকাল ফিরেছিস বলে তাই—

আমার সঙ্গে তুলনা কেন জননী? আমি যদি হোলনাইট মাঠে চরে বেড়াই, ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন মহিলা। কেস আলাদা।

পীযূষকান্তির ছায়াটা দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর দেয়ালের গা,

দরজার কপাট সব বেয়ে বেয়ে এঘরে চলে এল। বলে উঠল, সেই কথাটাই তোমায় মনে করাতে আসছিলাম সুরমা! মেয়েরা যে মেয়ে, সেটা তোমার ওদেরকে বোঝানো উচিত।

সুরমা হঠাৎ স্বামীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে চমকে উঠেই সামলে গিয়ে কটু গলায় বলে, শুধু আমি বোঝালেই তো হবে না। ট্রাম-বাসদেরও তাহলে বুঝতে হবে এরা মেয়ে, এদের দু' ঘণ্টার পথ আধঘণ্টায় পার করে দিই। গোলপার্ক থেকে তোমার এই সুখের স্বর্গে এসে পেঁছিতে কতক্ষণ লাগে নিজেই হিসেব কর।

পীযূষ বাইরের দিকে তাকায়, ঝিমঝিম করছে রাত। রাস্তা নিশ্চয় জনবিরল। বাস থেকে নেমে সাত আট মিনিটও তো হাঁটতে হবে। সেই দুটো তরুণী মেয়ে কোন সাহসে এরকম যথেচ্ছ রাত করছে।

গম্ভীর গলায় বলে পীযূষ, সেই হিসেবটা করেই গোলপার্ক ছাড়া উচিত।

কিন্তু সুরমা এই গম্ভীর গলার ধার ধারবে নাকি।

সুরমা কি কোনোদিন সেই ভয়ের শিক্ষা পেয়েছে? পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটা কি এযাবৎকাল পত্নীবৎসল স্বামীর ভূমিকাটি কত নিপুণ হতে পারে তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসেনি?

তবে?

তবে সুরমা কেন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলবে না, ওঃ হিসেব! তো—সে হিসেব কষতে হলে তো সবই ছাড়তে হয় ওদের। গান বাজনা লেখাপড়া কিছুই আর করে কাজ নেই, ঘরে বসে থাকুক। দুটো বরং গরু কিনে ফেল, মেয়েরা গো-সেবার পুণ্য অর্জন করুক, সময় অন্তর ঘুঁটে টুটে দিক।

তাই বলেছি আমি?

সুরমা বলল, বলনি, বলতে কতক্ষণ? নীলুর সাতটা অবধি ক্লাস, বুলুর মাস্টার রাত অবধি পড়ান, জান না তুমি?

টুটু বলে ওঠে, মাগো জননী, ফাদার যা যা জানতেন, তা কি আর এখন মনে আছে ওনার? কিন্তু রসনা সংবরণ কর জননী, সিস্টাররা এলেন বলে মনে হচ্ছে। এসেই যদি শোনেন ওনাদের ক্রিটিসিজম হচ্ছে, খেপচুরিয়াস হয়ে যাবেন।

পীযূষকান্তি, এখন তুমি চেঁচিয়ে উঠে বলবে কিনা, নাঃ কারুর ক্রিটিসিজম করা চলবে না, শুধু যথেচ্ছ ক্রিটিসিজম চালিয়ে যাবে পীযূষকান্তি বোসের। যেহেতু সে তার স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবতে চেষ্টা করেছে।

ভুল করা হয়েছে।

ভারী ভুল করা হয়ে গেছে হে পীযূষকান্তি, এ ভুলের প্রতিকার করা যায় কিনা ভাব।

খুব যেন একটা মজার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে পীযূষকান্তি। ছায়ার সঙ্গে বাক্যালাপ। যা মনে আসছে বলা যাচ্ছে তর্জনী তুলে তুলে।

বাক্যালাপ স্থগিত রাখতে হ'ল।

বুলু পায়ের চটিটা দালানের এক ধারে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে বাড়িতে পরবার রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে হাতের বইগুলো একটা জানলার ধারের বেদীতে নামিয়ে রেখে ডাক দিল, মা।

এ বাড়ির দেয়াল এত চওড়া যে, জানলার বেদীগুলো টেবিলের কাজ করে।

ডাক শুনে মা বেরিয়ে এসে মাতৃস্নেহকোমল গলায় বলে উঠলেন, বুলু এলি?

এই মেয়েটি দুর্বাসা, তাই এর সঙ্গে কথোপকথনে সুরমা সর্বদাই স্নেহকোমল। কে বলবে এই কণ্ঠই ক্ষণপূর্বে নিদারুণ কঠোর হয়ে উঠেছিল।

বুলু এ স্নেহের মূল্য দিল না, যেন প্রতিপক্ষের গলায় উচ্চারণ করল, একটু চা পাওয়া যাবে?

সুরমার আরো তোয়াজী গলা, ওমা, মেয়ের কথা শোন, এতক্ষণ পরে বাড়ি এলি, একটু চা পাবি না!

টুটু এতক্ষণ দালানের একধারে শূন্যে হাত ছুঁড়ে ব্যায়ামের ভঙ্গী করছিল, সেখান থেকেই উল্লসিত গলায় বলে ওঠে, মাইরি সিস্টার, এই জন্যেই তোকে এত সেলাম ঠুকি। আমি তো সেই থেকে ভাবছি জননীর যদি একটু কৃপা হয়—

সুরমা চড়া গলায় বলে ওঠে, ওঃ কৃপার অপেক্ষায় বসেছিলে? মুখ ফুটে বলতে কী হয়েছিল? আমি জানি চা কফির দোকানেই আড্ডা তোমাদের।

টুটু আক্ষেপের গলায় বলে, ওঃ মাদার, সে দিন আর নেই হায়। পকেট তো অলওয়েজ গড়ের মাঠ। মুখ ফুটে বলব কি, বলতে গেলেই যে হৃদয়ে বিবেকের কাঁটা ফোটে। হেলপার বলতে তো তোমার সেই গণেশের মা, কী কাজ করে গড জানে। তুমি তো স্বয়ং সারাদিন কী বলে ওই চণ্ডী সেলাই, জুতো পাঠ সব চালিয়ে যাচ্ছ; তার ওপর আবার—

চণ্ডী সেলাই, জুতো পাঠ। টুটু তুই আর বাংলা বলতে আসিসনে। সুরমা চড়াগলায় বলে, তবু ভালো যে একজনেরও আমার অবস্থাটা নজরে পড়ে।

বুলু গম্ভীর গলায় বলে, নজরে সকলেরই পড়ে মা। তবে করবার কি আছে বল? স্বয়ং মালিকই যখন এই ব্যবস্থা বহাল করেছেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ব্যাপারটা এবাড়ির কর্তা যেমন দেখালেন, তেমন কম লোকই দেখাতে পারে।

নীলুও বুলুর সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছে, সে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে মাকে সরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল, বুলুর কথায় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্ত গলায় বলে, তোর কথাটথাগুলো দিন দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুলু, যা মুখে আসে বললেই হ'ল?

বুলু ব্যঙ্গের গলায় বলে, তোমার মতো মহিমময়ী হতে পারছি না দিদি, দুঃখিত। তবে বেশীদিন তোদের ভুগতে হবে না আমায় নিয়ে; নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি শীগগির।

ওঃ সিস্টার, ব্রেভো!···টুটু বলে ওঠে, খুব শাঁসালো একখানা প্রেমিক ট্রেমিক জুটিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মাইরি সকলের থেকে কনিষ্ঠ হয়েও, তুই সকলের গুরু হয়ে গেলি।

টুটু বুলু খুব কাছাকাছি পিঠোপিঠি, বুলু কোনোদিন দাদা বলে না টুটুকে, ছেলেবেলা থেকে দুজনের ভাবও যত, খুনসুড়িও তত, কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি সেই হালকা খুনসুড়িকে প্রায় তিক্ততার পর্যায়ে তুলেছে। যদিও সেটা তোলে বুলুই।

এখনও বুলু কড়া গলায় বলে, ছোটলোকের মতো কথা বলিস না, আমি একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে ফেলেছি, এবং একটা মেয়ে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থাও করে নিচ্ছি।

অ্যাঁ! একদিনে এতখানি! জননী, এই মেয়েকে তুমি মাথায় নিয়ে নাচছ না? দে মাইরি, পায়ের ধুলো দে। হোক কনিষ্ঠ, তোর পদধূলি এখন গুরু পদধূলি।

টুটু! বড্ড বাড় বেড়েছিস। বলল বুলু।

পীযূষকান্তি যেখানে বসেছিল, সেখানে একটা পিলারের ছায়া, ওরা জানে না বাবা এখানে বসে। পীযূষকান্তি সাড়া দিচ্ছে না। না, আড়ি পাতবার জন্যে নয়, পীযূষকান্তি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল।

পীযূষকান্তি যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল এরা আমার ছেলে-মেয়ে? কিন্তু কোন ভাষায় কথা কইছে এরা? এ ভাষা কি আগে জানত?

এখন পীযূষকান্তি নিজের ছায়াকে বলল, নিজে যে তুমি কত কম জানতে এখন টের পাচ্ছ পীযূষকান্তি?

বুলুর কথা শেষ না হতেই সুরমা চেঁচিয়ে উঠল, বুলু, কী বলছিস কী? হোস্টেল মানে?

হোস্টেল মানে হোস্টেল। বুলু অবহেলা ভরে বলে, ভাবনার কিছু নেই। সম্পূর্ণ 'মহিলা নিবাস'। গার্জেনের শাসনের মতোই। আইনের কড়াক'ড়; রাত দশটার পর বাইরে থাকা বেআইনি। অতএব নির্ভয় হতে পার।

সুরমা ব্যাকুল গলায় বলে, তবে আর তোমার স্বাধীনতারই বা কী হ'ল, যে বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে যাবে?

বুলু কাটা কাটা গলায় বলল, 'বাড়ি ছেড়ে বাইরে' বললে ঠিক হ'ল না মা, বলা উচিত জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে।

টুটু লাফিয়ে ওঠে, এই, এইটা যা বলেছিস গুরুদেব, বাঁধিয়ে রাখার মতো কথা। এক মিনিটে কোথায় চাকরী জোটালি? আর এক আধটা পড়ে নেই?

নীলু এখন ট্রে সাজিয়ে চা এনে সামনে নামায়, বলে বাজে কথা শুনিস কেন টুটু, চাকরী পেয়ে গেছে। হুঁ, চাকরী অমনি গাছের ফল।

বুলু তীক্ষ্ণ গলায় বলে, যা জান না দিদি, তা নিয়ে কথা বলতে এস না।

নীলু শক্ত গলায় বলে, বাজে কথা বলতে এলেই আমি কথা বলব। চাকরী তোমার এখন আকাশে। শুধু একটু আশ্বাস পেয়েই হোস্টেলে সিট দেখতে গিয়েছিলে, আমার কাছে লুকোতে এস না।

তাই বল।

সুরমা স্বস্তির গলায় বলে, বাবাঃ! বলে কি না, একেবারে ঠিক করে এসেছি! ভয়ে আমার বুক কেঁপে গেছে। ওসব চিন্তা ছাড় বাবা!

বুলু তেমনি কাটা গলায় বলে, আমার পক্ষে এই জঙ্গলে পড়ে থাকা অসম্ভব।

সুরমা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, একা তোর পক্ষেই অসম্ভব?

আমার কথা ভেবে দেখেছিস? তোরা তো তবু বেরোতে পাচ্ছিস, আর আমি? আমি সারাদিন তোদের বাপের এই শখের প্রাসাদ আগলাচ্ছি, আর রন্ধনের বন্ধনে আটকে পড়ে আছি—

কী করা যাবে বল।

বুলু উদাস ভঙ্গিতে বলে, তোমার মালিক তোমায় যেভাবে রাখবেন, তুমি সেইভাবে থাকতে বাধ্য।

থাম বুলু, মালিক মালিক করিসনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পূর্ব জন্মের কোনো শত্রুতা ছিল ওর আমার সঙ্গে।

পীযূষকান্তি তার ছায়াকে বলল, কীহে তুমি উঠবে না? তোমার যা বলবার বলবে না?

তারপর ছায়াটা উঠে এল।

বলল, কোন জন্মের শত্রুতা কোন জন্মে শোধ হয় বলা শক্ত। হয়তো তাই। তবে আমি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এটা করেছিলাম। হ্যাঁ, তোমাদের কথা ভেবেই—

পীযূষকান্তি যে এই লম্বা দালানেরই একাংশে কোথাও বসেছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি, তাই ওর এই হঠাৎ উঠে এসে কথা বলায় চমকে উঠল ওরা। থতমত খেল।

তা সেটা সামলে নিতে সব থেকে কম সময় লাগল বুলুর। বুলু তার নতুন অভ্যাস করা কাটা গলায় একটু হাসির মতো করে বলে, বর্তমানটাকে বাঁধা দিয়ে ভবিষ্যৎ কেনাটা কি খুব বিচক্ষণের কাজ, বাপী?

নয় যে, সেটা এখন বুঝতে পেরেছি বুলু। ঠিক আছে, এর প্রতিকারের চেষ্টা করছি।

পীযূষকান্তি বোসের লম্বা ছায়াটা শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তার ডানলোপিলোর গদিটা নেচে উঠল কিনা অন্ধকারে বোঝা গেল না। হ্যাঁ ডানলোপিলোটিলোগুলো এখনো আছে। যে কদিন থাকে। তারপর হয়তো টিকিনের তোষক।

কে জানে পীযূষকান্তি বসল না শুল।

শুধু পীযূষকান্তির ছায়াটা তার গলার স্বর শুনতে পেল, কী আশ্চর্য! এমন সহজ সমাধানটা হাতের মধ্যে থাকতেও তুমি দেখতে পাচ্ছিলে না পীযূষকান্তি বোস? যাক এবার দেখতে পেয়েছ তো? ব্যস এরপর আবার যে রাজা সেই রাজা! এরপর থেকে আর তোমার শ্বাসে প্রশ্বাসে হিসেব কষতে হবে না। সত্যি কী বুদ্ধু আমি, ভেবে বসেছিলাম খাল যখন কেটে ফেলেছি তখন কুমীর আসবেই, খালটা যে বুজিয়ে ফেলা যায়, খেয়াল করিনি। যাক এবার তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও পীযূষকান্তি। তবে তোমাকে যে ওরা বোকা বলে, ভুল বলে না। চোখের সামনে সমাধান অথচ তুমি যন্ত্রণায় ছটফটাচ্ছিলে। ছিঃ।

সে দিনের পরদিন—

যেদিন আপন ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পীযূষকান্তি তার জীবনের এই জটিল সমস্যার সমাধানটা খুঁজে পেয়ে গিয়েছিল অন্ধকার ঘরে শুয়ে। কী আশ্চর্য, এতদিন এইটা মাথায় আসেনি তার! এই মাথায় না আসার জন্য এতদিন কী দুর্বহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।

পরদিন ভোর সকালে ঘুম ভেঙে উঠে নিজেকে অদ্ভুত হালকা লাগল পীযূষকান্তির। মনে হ'ল পৃথিবীতে নিশ্বাস নিতে কী অপর্যাপ্ত বাতাস। চোখ মেলে তাকাতে আকাশে কী অফুরন্ত আলো।··· চারিদিকে কী মুক্তির রোমাঞ্চ। উঠে পড়ে দেখল কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো। ওঠেও না। পীযূষকান্তি চির অভ্যাসের বশে বরাবর ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন।···

বালিগঞ্জের ওখানে থাকতে উঠে পড়ে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসতেন। অলক যখন আর সকলকে ঘরের মধ্যে বেডটী

পৌঁছে দিত, তখন পীযূষকান্তিকেও এক কাপ দিয়ে যেত।···এবং অন্যসময় মন্তব্য করত, মেসোমশাই যে কেন এই সাত সকালে উঠে বসে থাকেন!

হ্যাঁ, মেসোমশাই বলত অলক তার মনিবকে, অথবা—মনিবানীর বরকে। 'বাবু'ও নয়, 'সাহেব'ও নয়, মেসোমশাই!

পীযূষকান্তি বলত ব্যাটার ব্যাকরণ জ্ঞান টনটনে। 'মাসিমা' অতএব মেসোমশাই। তা তোমায় যে বড়ো 'মা' বলে না?

সুরমা গাঁইয়াদের মতো গালেই হাত দিয়েছিল, মা! আছ কোথায়? এখানে আবার 'মা' বলা আছে নাকি? সবাই মাসিমা বলে।

তাই নাকি? কিন্তু কারণটা কী? মা ছেড়ে মাসি! ফাঁসি দেবার সুবিধেটা ভালো মতো হবে বলে?

আহা! তা কেন? 'মা' আর 'বাবু' শুনলেই যে কেমন মনিব মনিব লাগে। ওদেরও তাই আর 'চাকর টাকর' বলা চলে না। হয় বলতে হয় 'লোকজন' কিম্বা 'বাজারের লোক' অথবা বলতে হয় 'হেলপার'।

এত তথ্যও জান তুমি! উঃ! সমাজ বিবর্তনের ধারাটি একেবারে মুখস্থ।···আচ্ছা তাহলে ঝামাপুকুরের বাড়ির ওখানে ঠাকুর চাকররা কী বলে ডাকত তোমায়—বলতো?

আহা জাননা যেন। বৌদি বলত না? ছোট বৌদি! ওরা নাকি তোমার বৌদিদের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই বৌদি—

পীযূষকান্তি হেসে উত্তর দিয়েছে—তার মানে তোমার একেবারে ডবল প্রমোশান। ছোট বৌদি থেকে একেবারে—মা-সি-মা!

সুরমা কৌতুকের হাসি হেসেছে, ওই শুনতেই মাসিমা। কথাবার্তা তো মাই ডিয়ারি।

পীযূষকান্তি চমকে বলেছে, তার মানে? এতে তুমি প্রশ্রয় দাও?

সুরমা অগ্রাহ্য ভরে উত্তর দিয়েছে এর আবার প্রশ্রয় দেওয়া দিইয়ি কী? হাসি খুশী ছেলেটা সব সময় একটু কায়দা করে কথা বলতে ভালোবাসে, তাই বলে। তাতে আমার কী লোকসানটা? সর্বদা চোখের সামনে একটি রাম গরুড়ের ছানা ঘুরে বেড়ালেই বুঝি খুব ভালো লাগত? তোমার এই হঠাৎ হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে যাওয়া দেখলে এত হাসি পায়। তুচ্ছ কারণে—

অথচ এখন?

এখন সুরমা ভুলে গেছে 'সিরিয়াস' হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো ভাবে থাকা যায়।···তবে বলতে পারা যায়, সুরমার ওই 'সিরিয়াস' হয়ে থাকাটার কারণ উচ্চ। পীযূষকান্তির মতো তুচ্ছ কারণে নয়।

যাক! আর সেই কারণটা থাকবে না।

পীযূষকান্তি রাখবেনা সেটা।

কী আনন্দ! নিজেকে যেন পাখির পালকের মতো দায়হীন ভারহীন হালকা লাগছে।

এখানে বারান্দা নেই, বেতের চেয়ার পাতা। আর বেডটীরও প্রশ্ন নেই, কাজেই পীযূষকান্তি ভোরবেলা উঠে বাগানে গিয়ে বেড়িয়ে নেয় একটু।

'বাগান' বললে অবশ্য শব্দটার অবমাননা করা হয়, সুরমা যা বলে সেটাই ঠিক বলে, বাগানই বটে। বল যে জঙ্গল। তবে ভালো গাছও কিছু আছে বৈকি। পীযূষকান্তি তাই বলে বাগান।

ঠাকুর দালানের পিছনে অনেকখানি খোলা জমি, সেটাই ওই জঙ্গুলে বাগান। পীযূষকান্তি ভোরবেলা ওইখানেই গিয়ে ঘোরে খানিক।

আজও তাই গেল। রোজকার মতো আজও দালানের পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ ওঠেনি, সব ঘর বন্ধ। আস্তে আস্তে

লম্বা টানা দালানখানা পার হয়ে গিয়ে দালানের কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে আস্তে গেটটা খুলে দাওয়ায় নামল।

চারিদিক তাকিয়ে দেখল। যেন নতুন দৃষ্টিতে কী নির্মল মনোরম পরিবেশ।···উঠোন ভর্তি গাছপালা, মেঝেটা সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা। সামনে পিছনে চারিদিকেই সবুজের সমারোহ।

আচ্ছা, এই দৃশ্যটা কী ওরা কোনোদিন দেখেনি?···দেখেনিই মনে হয়। কী করে দেখবে? ওরা যখন ওঠে, তখন ভোরের এই মনোরম শোভাময় দৃশ্যটিও থাকে না, এবং কোনো রকম 'দৃশ্য' দেখবার সময়ও ওদের থাকে না।

কিন্তু দেখলেই কি ওদের এই দৃশ্যটুকুর জন্যে মমতা আসত? যেমন আসছে পীযূষকান্তির। আসছে, বেশ আসছে।···

আসুক।

মমতাকে সবল মন থেকে ঝেড়ে ফেলবে পীযূষ বোস।···কিন্তু এখনও দু'চারদিনের মতো ওই জঙ্গুলে বাগানটায় গিয়ে মন কেমন করা মনটা নিয়ে একটু ঘুরে বেড়ালে ক্ষতি কী? কেউ কি বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারবে? হয়তো বুলু অভ্যস্ত ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলবে, বাপীর বাগান পরিদর্শন দেখলে মনে হয় যেন, 'গুলবাগিচায় সম্রাট সাজাহান। কী ম্যাজেস্টিক ভাব।'

টুটু হয়তো বলবে, উঃ! ফাদারের শৈশবকালে ফাদারের ফাদার কী শিক্ষাই দিয়ে গেছলেন। একেবারে ছেনি বাটালি দিয়ে পাথরে খোদাই করে ছেড়েছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে তাই বেচারী ফাদারের সারাজীবনে আর আয়েস করার সুখটুকু ঘটল না। রাত শেষ হবার আগে বিস্তারায় কাঁটা ফুটতে থাকে। তাই ঘুমের সব থেকে চমৎকার সময়টিতে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে—কী বলে ওই নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো কাঁটাবনে ঘুরে বেড়ান।

ওখানেও বলত টুটু, বারান্দাটা তো আর চেয়ারগুলো নিয়ে

পালিয়ে যাচ্ছে না, তবে ঘুমের সময় থেকে সময় কেটে নিয়ে ওটা দখল করতে আসা কেন ?

বলে, এই রকমই কথা বলে টুটু, তবে ওর কথায় তেমন হুলের জ্বালা নেই। সাপ যদি হয়েও গিয়ে থাকে ও হয়েছে জলসাপ।

নীলাই যা বরাবর সংসারের শান্তিরক্ষা প্রয়াসী, তাই নীলা যদি বলে তো বলে, তা মর্নিং ওয়াক তো ভালোই বাপু। আমরা পারিনা তাই।

শুধু সুরমাই বলে, আসল উদ্দেশ্য তোরা ধরতেই পারিস না। তোদের বাপী ওই জঙ্গল হাতড়ে খুঁজে দেখতে যায় কোথাও দুটো কাঁচা লঙ্কা ফলেছে কিনা, কোনো গাছে দুটো কাগজি লেবু ধরেছে কিনা, পাতা লতার আড়ালে কোনোখানে লাউকুমড়ো কি শশা কাঁকুড় লুকিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে কিনা, আর নারকেল গাছে ক' থাক ডাব ঝুলছে, কাঁঠাল গাছে কটা এঁচোড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সবেরই ইনস্পেকশান করতে যায়। দেখেছিস তো প্রথম প্রথম পেয়ারা গাছে পেয়ারা ঝুলছে দেখে কী লাফালাফি! যেন ফলটল যে সত্যি সত্যি গাছে ধরে এ ওনার জানাই ছিল না।·····অফিস ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়ে অফিসের লোককে বিলোনো হয়েছে, যেন পেয়ারা কেউ কখনো চোখে দেখেনি। এ জ্ঞান হয়। এসব দেখলে লোকের ধারণা হবে, আমরা একটা অজপাড়াগাঁয় এসে পড়েছি।···বলে বলে তবে সে দুর্মতি ছাড়িয়েছি।

এসব শুনে শুনে গা সওয়া হয়ে গেছে পীযূষকান্তির, তাই আরো দু'চারদিন এই 'বাগানে' ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে তার ভিতরে কোনো বিশেষ মমতা রয়েছে সেটা ধরা পড়বে না তা জানে।

এখানে বসার কোনো জায়গা নেই, তাই পায়চারি করতে করতেই সেই নতুন শেখা মজার খেলাটায় মাতে পীযূষকান্তি।

নিজের ছায়ার নাকের সামনে তর্জনি তুলে তুলে বলে, বুঝলে হে পীযূষকান্তি, অনেক আক্কেল সেলামি দিয়েছ, এবার সামলে গেলে।

…এখন, আজই, তোমার সেই হিতৈষী বন্ধুটির নাকের সামনে এইরকম করে আঙুল তুলে বলবে, ঢের হয়েছে ভাই, আর নয়, তোমার ওই মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়িটিকে তুমি ফেরৎ নাও। বর্তমানকে বন্ধক দিয়ে 'ভবিষ্যৎ' কেনবার সুপরামর্শ আর দিও না কাউকে।…দেখলাম তো ওই 'ভবিষ্যৎ' কিনতে যাওয়া মানেই দারিদ্র্য কিনে ফেলা। তার সঙ্গে ফাউ অশান্তি অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা। আর আর অনর্থক খানিকটা মায়ার জ্বালা, খানিকটা সেন্টিমেন্টের শিকার হওয়া। দূর!

বেশ ছিল পীযূষকান্তি বোস, এতদিনে হয়তো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়িটাকে বদলে একটা ফার্স্ট হ্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখত।…তার ছেলে গাড়ি চালানো শিখে ফেলে শহর পয়লট্ট করে বেড়াত, আর বলত, নাঃ, ফাদার লোকটা ভালো। মনটা দরাজ আছে।…পেট্রোলের হিসেব কষেনা।

স্ত্রী মৃদুমধুর কটাক্ষ হেনে বলত, যাই বল বাপু, গাড়ি একখানা এসেনসিয়াল। বল, ঠিক বলেছিলাম কিনা?

বড়োমেয়ে শান্ত গলায় বলত, সত্যি একটা গাড়ি থাকলে কিন্তু মনটা বেশ ভরাট ভরাট লাগে।

আর ছোট মেয়ে পীযূষকান্তির গলা ধরে ঝুলে পড়ে বলত—বাপী, বাপী, তুমি কী সুইট!

এই সব সুখ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করেছ হে বন্ধু, কিন্তু আমি তোমার হাত পিছলে ফসকে পালিয়ে আসছি আবার।

কী মুক্তি! কী মুক্তি!

কিন্তু—

হঠাৎ একটা আশঙ্কায় কণ্টকিত হয় পীযূষ। যদি সুধাময় মুখের ওপর হেসে উঠে বলে, বাড়িটা ফিরিয়ে নেব মানে? জিনিসটা কি আমার? যার জিনিস সে তো টাকা কড়ি মিটিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমি কে?

তাহলে?

তাহলে ?

হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে ওঠে পীযূষকান্তি, একটা মরা গাছের শুকনো ডাল তুলে নিয়ে একটা মোটা গাছের গুঁড়িকে আঘাত হানতে হানতে প্রশ্নোত্তরের মালা সাজায়—

তা বললে শুনব না। আবার খদ্দের জোগাড় কর তুমি। আমি লাভটাভ চাইনা, এমন কি রিপেয়ারিঙের যা খরচ হয়েছে, তাও ছেড়ে দিতে রাজী আছি। তুমি শুধু ওই হিমালয় পর্বতকে আমার মাথা থেকে নামাও।

সুধাময় :—চট করে খদ্দের আমি এখন কোথায় পাব ? এতোবড়ো বাড়ি কেনার মতো এলেমদার লোক সব সময় হাতের কাছে থাকে না।

পীযূষ :—ওঃ তাই ! তাই আমায় একটা মস্ত এলেমদার দেখে অতোকরে জপিয়ে জপিয়ে আমার জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ।

সুধাময় :—কী বললে ? আমি তোমার জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি ? তোমার ক্ষতি করেছি ? একেই বলে দুনিয়া ! আমি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলাম, ভাই।

পীযূষ :—তা ভেবেছিলে ঠিকই। কিন্তু বর্তমানটার কথা ভাবনি। সারাক্ষণ ওয়ান পাইস ফাদার মাদার করতে আমার কী কষ্ট জান ? অফিসের গাড়ি থেকে নেমে প্রাইভেট বাসে চেপে আমি যে কী অবস্থায় বাড়ি যাই, ধারণা করতে পারবে না।

সুধাময় :—পারব না মানে, বল কী হে ? আমিও তো যাই। আরও হাজার হাজার ভদ্র ব্যক্তি যায়। সবাই যায় বলেই অতো ভীড়। চিরকাল উড়নচণ্ডে বলেই এটায় তোমার এতো কষ্ট।

পীযূষ :—শুধু কি আমারই কষ্ট ? আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যারা ? তাদের কী হাল হয়েছে ভাবতে পারবে না। নেচারগুলোই বদলে গেছে। রাতদিন সাপের ছোবল খাচ্ছি।

সুধাময় :—তাদের তুমি রাজার হালে মানুষ করেছ বলেই এ অবস্থা। তোমার ঝামাপুকুরের বাড়ির ছেলে মেয়েরাও তো এই ভাবেই হাড় পিষে স্কুল কলেজ করছে, কই 'খুব কষ্ট' বলে তো আক্ষেপ করছে মনে হয় না। আমার ভাইতো ওই পাড়াতেই থাকে।

পীযূষ :—জানি না, ঝামাপুকুরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমার আর এখন কোনো ধারণা নেই। আমি যে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে এলাম, ফের সেই জীবনে ফিরে যেতে চাই।

সুধাময় :—বেশ! বলতো খদ্দের দেখতে চেষ্টা করব।

পীযূষ :—কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পার। মুখ বেজার কোরো না, মনে রেখ : আমায় তুমি জোর করে—

হাতের ডালটা ভেঙে টুকরো হয়ে ছিটকে হাত থেকে পালিয়ে গেল।...চমকে উঠল পীযূষকান্তি। তারপর হেসে উঠল, আরে আমি কি ওই গাছটাকে সুধাময় ভেবে ধরে ঠেঙাচ্ছিলাম না কি?

যাক, আজিই একটা জোর ধাক্কা দিতে হবে।

রোদ উঠে গেছে।

বাড়ির মধ্যে চলে এল পীযূষকান্তি।

দেখল ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিল, এখনো তেমনি রয়েছে। সেই লম্বা চওড়া টানা দালানটা এখনো একটা দরাজ শূন্যতা নিয়ে পড়ে আছে।

মস্ত দালানটার মাঝখানে সেই খাবার টেবিলটা পড়ে আছে ক'খানা চেয়ারকে পার্ষদ করে।

পীযূষ মনে মনে চেয়ার সমেত টেবিলটাকে ঠেলে উঠোনে নামিয়ে দিল। তার পর ওই দরাজ দালান জুড়ে সারি সারি অনেক আসন পাতল। সাধারণ সতরঞ্চের আসন, একসঙ্গে অনেক লোক

খেতে বসলে যেমন পাতা হয়। তারপর মনে মনেই তার ওপর লোক বসিয়ে দিতে লাগল।

এই বাড়িটা বেচে দেওয়ার আগে একবার একসঙ্গে ফুলটুসিদের সবাইকে, আর ঝামাপুকুরের বাড়িশুদ্ধ সকলকে নেমন্তন্ন করবে। নির্ভয়েই করবে, তখনতো আর ঋণের পাহাড় মাথায় চাপানো থাকবে না। একটা কিস্তি শোধ দেবার টাকাটা তুলে নিয়েই—

তাছাড়া এই বাড়িটায় এতো জায়গা, আশেপাশে এতো খোলা-মেলা যে সুরমা তার 'অসুবিধে'র প্রশ্ন তুলতে পারবে না। স্ত্রী-কন্যার ওপর কোনো দায়দায়িত্বও চাপাবে না, হালুইকর ঠাকুর ডেকে আনবে।·····

একটা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে পীযূষ।

যেখানে সেখানে ইঁট চাপিয়ে উনুন জ্বালবে, বড়ো বড়ো হাঁড়ি কড়া ওই টিউবওয়েলে মেজে আনবে। সারাদিন সবাই মাঠে—বাগানে ছুটোপুটি করবে, আর বলবে কী চমৎকার বাড়িই কিনেছ তুমি!

না, ওদের কাছে তখনও বাড়ি বেচে দেওয়ার কথা বলবে না পীযূষ। ওরা ভাববে এটা বোধহয় গৃহপ্রবেশের মুলতুবি নেমন্তন্ন।

বৌদিদের, দাদাদের, ফুলটুসি আর তার বরের এবং ছেলেপুলেদের মুখগুলো যেন চোখের উপর দেখতে পায় পীযূষ।··· ওদের মুখে খুশির আলো, ওরা যেন বলছে, মাঝে মাঝে এখানে পিকনিক করতে আসব।

হ্যাঁ, সুন্দর একটি পিকনিকের দিনের ছবি দেখেছিল সেদিন পীযূষ, ভোরবেলার আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘুরে ঘুরে পুরো বাড়িটা দেখেছিল।

আশ্চর্য! কত সব ফালতু জায়গা এখানে সেখানে। অকারণ সব ছোট ছোট ঘর। তাছাড়া ঠাকুর দালান।

টানা লম্বা অনেকগুলো সিঁড়ির উপর মোটামোটা থামের গায়ে ভর দেওয়া দু'সারি খিলেনের ভিতর মূল দালান।

…না, এই দালানটাকে ড্রইং রুম করা হয়ে উঠেনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর রয়েছে বাড়িটায়। একখানা বড়ো ঘরের মধ্যে ড্রইং-রুমের আসবাবগুলো ভরে রাখা হয়েছে; কিন্তু ঘরটা এতই বড়ো, সবই যেন অকিঞ্চিৎকর লাগে। তাছাড়া গুছিয়ে বসেই বা কে?

নাঃ এতো বড়ো বাড়ির কোনো মানে হয় না, মনে মনে বল্লে উঠল পীযূষ, ছোট মাপের মানুষদের জন্য ছোট খাটো বাড়িই ঠিক।

যে বাড়িতে মাপা টেবিলের বাইরে আর একটা পাত বেশী পাতা যাবেনা, গোনা বিছানার বাইরে আর একটাও বিছানা পাতা যাবেনা, তেমন বাড়িই সুরমার পক্ষে ভালো।

গড়িয়াহাটের সেই ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে গেলেও, আশেপাশে আর একটা ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না। কাঁকুলিয়ায়, বেলতলায়, গোলপার্কের ধারে কাছে, কি সাদার্ন অ্যাভিনিউতে। ওইটাই যখন পীযূষের স্ত্রী-পুত্রের কাছে স্বর্গাঞ্চল।

পাঁচশো টাকায় হয়তো পাওয়া যাবেনা, তাতে কি? তখনতো ধারশোধ করেও অনেকটাকা হাতে থাকবে। তাছাড়া—শেষ বেশ আরো একটা ভারি ইনক্রিমেণ্টতো আছেই তোলা।

এরপরতো আর পীযূষকান্তি বোসকে তার স্ত্রী সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না। কী শান্তি, কী সুখ!

মায়া? মমতা? একী পীযূষের সাতপুরুষের ভিটে? হ্যাঁ, বাড়িটার এই বৃহৎ আর বনেদী চেহারার আকর্ষণ আছে।…যাক সেটা কাটানো যাবে।

* * * *

অফিসের বিভূতিরায় সুধাময় সরকারকে বলে, ব্যাপার কী সরকারদা? বোস সাহেবের সঙ্গে আর বাক্যালাপ দেখি না যে? এইতো কিছুদিন আগেও তো দু'জনে এক হলেই গুজগুজ ফুসফুস। আমরা বলাবলি করতাম, বোস সাহেব বাল্যবন্ধুত্বের মহিমা দেখাচ্ছেন বটে—

সুধাময় অকারণেই গলা নামিয়ে বলে, আর বোলানা ভাই! কলিতে কারো ভালো করতে নেই। অতগুলো টাকা মাইনে পায় লোকটা, একটা পয়সা রাখতে পারে না। তাই পরামর্শ দিয়েছিলাম, আখেরের কথা ভাব, একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় কর।

বিভূতি খুব উৎসাহের গলায় বলে, যথার্থ বন্ধুর উপযুক্ত কথাই বলেছিলে। তা সাহেবতো কিনলেন বাড়ি।

সুধাময় বলে, সে একরকম আমার আপ্রাণ চেষ্টায় ভাই। কথা উড়িয়ে দেয়; গাড়ি কেনার জন্যে পাগল। তা আমিই উদ্যোগ আয়োজন করে—

বিভূতি বলে, জানি রাজপুরে না সোনাপুরে কোথায় একটা পুরনো বাড়ি কিনিয়ে দিয়েছিলেন!

মনে মনে অবশ্য বলে বিভূতি, নিশ্চয়ই মোটা দালালী পেয়েছিলে তাদের কাছে। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, রাজপুরে বাড়ি কেনা।

তা মনের কথা তো শোনা যায় না, তাই সুধাময় সরকার দু'হাত তুলে বলে, হ্যাঁ সেই হ'ল অপরাধ। অতদূরে বাড়ি—পাড়া গাঁ; বৌ ছেলের পছন্দ নয়, বাড়িতে অশান্তি; অতএব সবকিছুর মূল আমি, তাই আমার সঙ্গে আর ভালো করে কথাই নেই।

বিভূতি বলে, এতোই যদি তো আবার বেচে দিননা বাড়িটা—

আমিও তাই বলব ভাবছি। সুধাময় বলে, আর একটা ভালো খদ্দের হাতে এসে গেছে। এক রিটায়ারড ভদ্রলোক, বর'বর বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী হয়ে থেকেছেন, এখন বঙ্গভূমিতে বাসা বাঁধতে চান, তবে শহরের ঘিঞ্জিতে নয়। শহরের কাছাকাছি কোনো শহরতলীতে খোলামেলা কিছু জমিটমি সমেত বড়োসড়ো বাড়ি চাই বলে কাগজে অ্যাড্‌ভাটাইজ করেছিলেন ভদ্রলোক, আমার সঙ্গে এখন চিঠিপত্র চলছে।···কিছুকাল আগে হলে আর ওই মস্ত বাড়িটা পীযূষ বোসকে কিনিয়ে দিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়তাম না। যাক বলে দেখি, তখন তো 'এক-বুড়ির বাড়ি' বলে জলের দরে পাওয়া গিয়েছিল। এখন ভালো দাম পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক তো নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'লাখ টাকার মধ্যে—'

বিভূতি রায় হেসে বলে, আপনার তাহলে দুদিক থেকেই লাভ!

সুধাময় ফোঁস করে ওঠে, লাভের চিন্তায় এসব করতে যায় না সুধাময় সরকার। এখন পীযূষ বোসের কাছে মুখটা রাখতে পারলেই বাঁচি। তবে মনে রেখ ভাই, বাড়ি আর এ জীবনে করে উঠতে পারবে না পীযূষ বোস। ও জিনিস দু'বার হয় না। বাড়িটার গৌরব ছিল, আভিজাত্য ছিল।···কত দোল দুর্গোৎসব হয়েছে এক সময় —

বিভূতি বলে, সাহেব তো একবার গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নও করলেন না। করলে নয় একবার দেখা হয়ে যেত।

ওই 'গৃহপ্রবেশের' নেমন্তন্নটা যে সুধাময়েরই বারণ, ভূত ভোজন করিয়ে খরচা না করে টাকাটা ধার শোধে লাগানোই সমীচীন, এ পরামর্শ সুধাময়েরই, কিন্তু সে কথা ফাঁস করে না সে। তাই দু'হাত উল্টে বলে, সাহেব মানুষ, ওসব মানলে তো? যাক, সেই ভদ্রলোক তো সামনের সপ্তাহেই কলকাতায় আসছেন, এসে না কি শালীর বাড়ি উঠতে হবে, তাই চাইছেন যত শীগগির হয়—

বোস সাহেব রাজী হবেন তো ?

সুধাময় বলে, রাজী করাতে হবে। বলব, বাড়ি নিয়ে যখন তোমার এতো অশান্তি—

কিন্তু সুধাময় ভাগ্যবান পুরুষ, তাই তার অনুকূলেই ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হতে চলছিল।

*　　*　　*　　*

বাপী শেষরাত্তির থেকে অমন ভূতাশ্রিতের মতো সারাবাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেন মা ?

চায়ের টেবিলে এসে বলে উঠল বুলু।

বুলু তার দৈনন্দিন পদ্ধতিটা প্রায় আগের মতোই রেখেছে। চা-টা অলকের বদলে দিদি দিচ্ছে, কি মা দিচ্ছে, তাকিয়ে দেখে না। তার কাছে কেউ সেটা প্রত্যাশাও করে না।

সুরমা বলল, তা সে কথা আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন ? ভূতে যাকে পেয়েছে, তাকেই জিজ্ঞেস কর।

দরকার নেই বাবা। তবে জানলা দিয়ে দেখলাম হল থেকে নেমে তোমাদের ওই কী বলে ঠাকুর দালানে ঢুকে ঘাড় তুলে তুলে কতক্ষন দেখল, তারপর আবার বাগানে নেমে গেল! বাগান মানে আর কি ওই তোমার জঙ্গলটা।

টুটু তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে বলল, জায়গাটা সত্যি বাগান করতে পারলে অনেক লাভ হয় কিন্তু। বাজার করে খেতে হয় না।

বুলু হি হি করে হেসে ওঠে, তবে লেগে যা। রায়বেঁশে সাজ থেকে নেমে পড়ে বল, কোদাল চালাই ভুলে মানের বালাই, ঝেড়ে অলস মেজাজ—হি হি, হবে শরীর ঝালাই।

চায়ের টেবিলে হাসির রোল ওঠে।

অতঃপর আবার কথা।

এই, ফাদার কোথায় ?

চানের ঘরে।

এক্ষুণি ?

আর কী করবে। যা একখানা ভূখণ্ডে বাস করা হচ্ছে, সকালবেলা তো খবরের কাগজের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। কাগজ আসে বেলা ন'টায়।

পুওরম্যান, আর কি করবে ? চা খেয়েই শেভিং করতে বসে, আর তৎপরে চানের ঘরে ছোটে।

উপায় কি! দুটি ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হবে তো? সত্যি দেখলে দুঃখ লাগে।···নীলু বলে, আমার লাগে না।

নীলুর কথার উত্তরে টুটু বলে, কেউ যদি ইচ্ছে করে কষ্ট পায়, করার কী আছে?

পীযূষ এসে খাবার টেবিলে বসে।

এতো সকালে ভাত খেতে পারে না সে, খায় দু'খানা টোস্ট কিছু আলুসিদ্ধ, হয়তো একটু মাছ ভাজা। সুরমা সামনে এনে ধরে দেয়।

পীযূষ হঠাৎ বলে ওঠে, আবার পুরনো পাড়াতেই ফিরে যাওয়া যাক, কী বল?

সকলেই চকিত হয়।

কী এ? ঠাট্টা?

পীযূষের মুখে এমন হালকা সুর তো কই আজকাল শোনা যায় না।···সুরমা ধরে নেয় ঠাট্টা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনো উচিত জবাব দিতে পারে না বলেই, গুম হয়ে যায়।

পীযূষের মন আজ প্রজাপতির পাখার মতো হালকা। কারণ পীযূষকান্তির ঘাড়ের উপর চেপে বসা গন্ধমাদন পর্বতটা কোন ফাঁকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। তাই পীযূষকান্তি সেই পূর্বেকার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, নাঃ, ভেবে ঠিক করছি আর এখানে নয়। এখানের জলে তোদের মার গাত্রবর্ণ প্রায় ওই গণেশের মায়ের মতো হয়ে উঠছে। এটা একটা দারুণ লোকসান।

পীযূষের কথার ভঙ্গীতো এই রকমই, শুধু কাঠগড়ার আসামী হয়ে পর্যন্ত, স্বাভাবিক বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে।

কিন্তু এই স্বাভাবিকতাটা গ্রহণ করা এখন অনভ্যাস হয়ে গেছে এদের, তাই সুরমা কড়া গলায় বলে, গ্রামে বাস করছি, একটা গ্রাম্য প্রবাদই ব্যবহার করি, কেটে কেটে নুন দেওয়া বলে একটা কথা আছে না? শুনেছি কারো কারো স্বভাবে সেটাই একটা মজার খেলা।

ঠিকরে উঠে যায় সুরমা।

নীলু আস্তে আস্তে বলে, একেইতো মার কষ্টের শেষ নেই, এরকম ঠাট্টা করা তোমার উচিত হয়নি, বাপী।

পীযূষও আস্তে বলে, আমি কিন্তু ঠাট্টা করিনি নীলু, সত্যিই ঠিক করছি—

টুটু অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে বলে, সত্যিটা ঠাট্টার মতো শোনালে মুশকিল, বাপী!

পীযূষ হতাশ গলায় বলে, ঠাট্টার মতো শোনালেও বলছি—সত্যিই আবার ওই পাড়াতেই ফিরে যাব। এ বাড়িটা বেচে দেব।

ও মাই গড! বাড়িটা বেচে দিয়ে? ওই আনন্দেই থাক, তোমার মতন এমন ইয়ে আর কেউ হবে না বাপী, যে এই প্রাচীন দূর্গটি ক্রয় করতে আসবে। খদ্দের পাবে তুমি?

পীযূষ একটু চমকে যায়।

আরে টুটুরও এ সন্দেহ হচ্ছে? হঠাৎ যেই ভেবেছে পীযূষকান্তি, বাড়িটা বেচে ফেললেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়, অতগুলো ক্যাশ টাকা হাতে এসে গেলেই ধারগুলো শোধ করে ফেলে আবার সে রাজা। সেই আহ্লাদে ভাসছে।···বেচে ফেলাটা যে তার নিজের হাতে নয়, সে কথা খেয়াল করেনি।···

আবার মনমারা হয়ে গেল পীযূষ। অদৃশ্য সুধাময়কে ধরে ঠেঙানো যায়, কিন্তু সত্যি তো তা হয়না। যদি সহজে বিক্রী না হয়? কেমন করে বিক্রী করতে হয় তা তো আর জানেনা পীযূষ। ইদানীং তো আর দেখাই হয়না সুধাময়ের সঙ্গে। কী ভাবে বলা যাবে?

* * * *

তা পীযুষকান্তি বোসেরও কপালটা এখন বোধহয় ভালোর দিকেই। তাই সেই দিনই অফিসে সুযোগ বুঝে এক সময় সুধাময় সরকারই নিজে থেকে বলে উঠল, তোমাকে বাড়ি কিনিয়ে দিয়ে তো দেখছি প্রায় বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে, ভাই। প্রাণে সুখ পাচ্ছি না। আমি বলি, বাড়িটা তুমি বেচেই দাও। বল তো খদ্দের দেখি।

পীযুষ সুধাময়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকায়, সুধাময়ই তো! নাকি, ছদ্মবেশী ভগবান?

কিন্তু বাইরে এই বিচলিত ভাব প্রকাশ করা চলে না, অবিচলিত গলাতেই বলতে হয়, তুমি বললে ভালোই হ'ল, আমিও ভাবছিলাম কথাটা তোমায় বলি। আমারও—

ইতিমধ্যে অবশ্য সুধাময় নতুন পার্টির সঙ্গে অনেকটা পাকিয়ে এনেছে, আর পীযুষকে রাজী করাতে কতটা কাঠ খড় পোড়াতে হবে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করছে, তবু হঠাৎ এহেন অনুকূল প্রস্তাবে নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে দুঃখু-দুঃখু মুখে বলে, আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি বলে কিছু যদি মনে করে থাক ভাই, কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

আরে দূর।

পীযুষ বলে, বলেইছি তো, আমারও নানান অসুবিধে, বাড়িতে কেবলই অসন্তোষ। ও তুমি একটু চেষ্টা চালাও। তাড়াতাড়িই চালাও।

সুধাময় আরো করুণ হয়, আর একটু ভেবে দেখ ভাই, বাড়ি হচ্ছে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর দয়া না হলে বাড়ি হয় না।

পীযুষ উদাস হাসি হাসে, সবাইয়ের কপালে লক্ষ্মী সয় না হে, আমি মনকে ঠিক করে ফেলেছি।

সুধাময়ের গলা কাঁপে, চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, তুমি যখন বলছ, তখন আমার সাধ্যমতো করব, উঠে পড়ে লেগেই করব, কিন্তু ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে পীযূষ, ওই বাড়িটা তুমি—যাক, তোমার কিছু লাভ আমি করিয়ে দেবই। পার্টি যোগাড় করে ফেলেই মোটা দর হাঁকব। আমার কোনো লাভ রাখতে চাই না।

পীযূষ তখন মনে মনে পীযূষের ছায়ার সঙ্গে কথা বলছে, ও পীযূষকান্তি বোস, হঠাৎ তোমার লাকটা এমন আকাশমুখী হয়ে গেল কী করে? তুমি যা চাইছ তাই পেয়ে যাচ্ছ, ব্যাপার কি?···ঠিক আছে। এবার তোমার লাককে বল, যেন গড়িয়াহাটার কাছে একখানা ছবির মতো সুন্দর ফ্ল্যাট জোগাড় হয়ে যায়। এমন একখানা ফ্ল্যাট যে, দেখে তোমার ওই হঠাৎ কেউটে গোখরো হয়ে ওঠা ছেলে মেয়েদের বিষ দাঁত ভেঙে যাবে।···আর তোমার স্ত্রী আবার সোহাগের হাসি হেসে তোমার গা ঘেঁষে বসবে।

সুধাময় বলল, তবে একটা পরামর্শ দিই ভাই—

পীযূষকান্তি হাত তুলে বলল, থাক সুধাময়, এখন একটু ব্যস্ত আছি।

মনে মনে বলল, তোমার পরামর্শর আর দরকার নেই। আমার যথেষ্ট হয়েছে। তবে হ্যাঁ, তোমার উপকারকে একেবারে অস্বীকার করতে পারিনা। আমার চোখে একটা ভুল চশমা ছিল। তুমি সেটা বদলে দিয়ে একটা কারেক্ট চশমা সাপ্লাই করেছ। বেশ সুন্দর দেখতে পাচ্ছি তাতে, খুব ঠিক।

'ঠিক দেখার' আহ্লাদে সেই দিন থেকেই দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ায় ভালো ফ্ল্যাটের সন্ধান করতে থাকে পীযূষকান্তি

বোস। এখন আর কারো মুখাপেক্ষী হচ্ছে না পীযূষকান্তি, ব্যবস্থা নিজের হাতে নেবে।

অফিসে আড়ালে আলোচনা ওঠে, বোস সাহেবের ব্যাপারটা কী বলুন তো? যখন তখন অফিসের গাড়ি নিয়ে, নয়তো ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অফিস আওয়ারে হরদমই যেন টেলিফোনে এমন সব বাতচিৎ করছেন যা অফিসের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না।

মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে হতে পারে।

আপনি আর হাসাবেন না মশাই, আজকাল আবার ওনাদের মতো ঘরে ওই ভাবে মেয়ের বিয়ে হয় নাকি? পাত্র ফাত্র ঠিক মেয়ের বাপ করে না, মেয়ে নিজেই করে। বিয়েও করে নেয়। 'ফর শো' একটা পার্টি ফার্টি দেয় বাপ।...আমার মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার। নিজে কোনো বিজনেস ফিজনেসে নামছেন কিনা কে জানে।

নিজেদের থেকে পদমর্যদায় কিছু উঁচু এমন মানুষকে নিয়ে অকারণ আলোচনা করতেও ভালোবাসে লোকে।

পীযূষকান্তি অবশ্য এসব টের পায় না, কেউ তার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি হানছে, ভাবেও না। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রের সাধন করে ছাড়ে। হ্যাঁ...সুন্দর ফ্ল্যাট। কেউটের বিষদাঁত ভাঙার মতোই। দক্ষিণাটা অবশ্য অনেকটা মাত্রা ছাড়ানো, তা হোক! চিরদিনই তো পীযূষকান্তি মাত্রা ছাড়ানোর ওপরই থাবা বসিয়ে এসেছে, থাবায় ভরে নিতেও পেরেছে। তার কারণ—স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবেনি।

এখনো আর ভাববে না।

ফ্ল্যাটটার তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হ'ল।

হয়ে গেল ম্যানেজ, পুরো মাসের মাইনেটা পকেটে ছিল। অন্য কোনো বাবদের চিন্তাতো আর করতে হবে না। আগামী কালই সুধাময় তার নতুন পার্টিকে নিয়ে যাবে বাড়ির বায়না করতে। মোটা টাকা ক্যাশ দিয়ে বায়না করতে রাজী ভদ্রলোক, যদি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যান।

বাড়িটা না কি, ভিতরে না ঢুকলেও, বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে দেখেছেন, খুব পছন্দ। পীযূষ জিগ্যেস করেছিল, ওনার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে এসব আছে?

সুধাময় অবাক হয়েছিল, থাকবে না? না থাকলে বড়ি কাদের জন্যে? ভালো ভালো পাশটাশ করা ছেলেমেয়ে। একটি ছেলে তো বাইরে পড়তে গেছে। একটি ছেলে—

পীযূষ হাত তুলে বলে, থাক ওসব শুনে কী হবে? তুমিতো আমার মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করছ না।

সুধাময়কে একটু ডাউন করতে পেরে বড়ো খুশী হচ্ছে আজকাল পীযূষ।

আবার নিজের স্বভাব বশে ডাউন হয়ে যাওয়া সুধাময়ের ম্লান মুখটা দেখে একটু লজ্জিতও হ'ল পীযূষ বোস। অতএব তাড়াতাড়ি ফুটো রিপু করতে বসল, বায়নার সঙ্গে সঙ্গেই তো তোমার পার্টি গলা ধাক্কা দেবে না? দু'চারদিন থাকতে দেবে তো?

সুধাময় আবার কৃতার্থ হয়। সেও আরও তাড়াতাড়ি বলে, আরে বলছ কী? আইনতঃ তিনমাস পর্যন্ত সময় নেওয়া যায়, পার্টির ইণ্টারেষ্টেও নিতে হয় অনেক সময়, সম্পত্তির মালিকানা সত্ত্বে কোনো গোলমাল আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখার দরকার থাকে। তাছাড়া বিক্রেতারও তো বাড়ি ছাড়ার সুবিধে অসুবিধে আছে।

একটু ইতস্ততঃ করে বলে, তবে ভাই তুমি বলেই বলছি, সে ভদ্রলোকের বড়ো আতান্তরের অবস্থা বলে আমি তিন সপ্তাহের সময় নিয়েছি—

ও যথেষ্ট যথেষ্ট! এনাফ!

উল্লসিত গলায় বলে ওঠে পীযূষকান্তি।

হাতের মধ্যে সেই ছবির মতো ফ্ল্যাটটার দাবি পেয়ে যাওয়ার দলিল। আর কে পায় তাকে?

সুধাময় বলল, তাহলে আবার ভাড়াটে ফ্ল্যাটে ?

হ্যাঁ হে। তাই। তাছাড়া কী ? যাকে যা মানায়।

অতঃপর চটপট অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে একটা ট্যাক্সী ধরে অনেকদিন ভুলে থাকা সেই চিরপরিচিত রাস্তাটার দিকে রওনা হয়।

* * * *

ফাদার আমাদের নাকের সামনে কাল একটা পাঁচ লাখ টাকার লটারীর টিকিট ধরে দিয়েছে, বুঝলি পপি।

টুটু পপিদের বাড়ি বসে চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট চিবোতে চিবোতে বলে, কাল সে কী দরাজ মেজাজ ফাদারের!

পপি ভুরু কুঁচকে বলে, আবার ফাদার? অভ্যেস আর ভালো করবে না তা হলে? কেন বাপী বললে কী হয়?

আরে বাবা, ও দুইই তো একই। বরং বাংলাটা কেমন পানসে পানসে, ইংরেজীটা বেশ গর্জাস। ধরনা কেন, তোকে যদি ডার্লিং না বলে প্রাণেশ্বরী বলি, কোনটা তোর—

আঃ টুটু, অসভ্যতা করবি না বলছি। কে কোথায় কান পেতে আছে, কে জানে।

ওঃ। তাহলে গলা খাটো করে অসভ্যতা করা চলে বলছিস!

টুটু মার খাবি বলছি। সবসময় তো পেঁচা মুখ করে থাকিস, আজ যে দেখছি ফুর্তির বান ডাকছে। লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেছিস বুঝি?

পাইনি! পাব!

টুটু ভয়াট গলায় বলে, বা—ইয়ে বাপী বলেছেন, ওই পাড়া গাঁয়ের বাড়িটা বেচে দিয়ে আবার এই পাড়ায় উঠে আসবেন।

ওঃ! এই কথা! পপি গিন্নীর মতো দুই হাত উল্টে বলে, রাধাও নেচেছে, সাতমণ তেলও পুড়েছে।

তার মানে? তার মানে?

মানে—ও বাড়িও বিক্কিরি হবে না, আর এ পাড়ায় ফ্ল্যাটও পাওয়া যাবে না।

টুটু করুণ মুখে বলে, যা বলেছিস পপি, আমারও তাই মনে হচ্ছে! ...বুলু শয়তানটা তো আবার বলছে, বাপীর ওসব স্রেফ ধাপ্পা। আমরা দারুণ খেপচুরিয়াস হয়ে আছি বলে ওই মিষ্টি বুলিটি দিয়ে ভাঁওতা দিয়েছে বাপী।

ধ্যেৎ! মেসোমশাই মোটেই ওরকম লোক নয়, হয়তো সত্যিই তোদের দুঃখু দেখে মনে হয়েছে—

বেচারী ফাদার নিজেও তো কম কষ্ট পায় না।

টুটু সহানুভূতির গলায় বলে, কিন্তু কী করা যাবে বল? দেখে মায়ার বদলে রাগই হয়। ওই যে স্বখাত সলিল না কি বলে, তাই তো!

পপি উঠে গিয়ে কোথা থেকে মুঠোয় ভরে চারটি ডালমুট এনে টুটুর প্লেটে দিয়ে বলে, আর একটু চা খাবি?

ভালোবেসে দিলে চা কেন, চিরেতার জলও খেতে রাজী আছিরে!

ওঃ তার মানে আমার তৈরি চা চিরেতার জল, কেমন? ঠিক আছে, দেবনা।

বাঃ চমৎকার! বেশ সুবিধে মতো মানে খাড়া করেছিস তো? অফার করাও হ'ল আবার খাটতেও হ'ল না। যা যা নিয়ে আয়, কোথায় তোর চা আছে। চাটটা ফুরিয়ে যাচ্ছে—

চাট? আহা। বলে সাধ মিটোচ্ছিস, না?

বলে একটা পাক খেয়ে উঠে গিয়ে আর দু'কাপ চা নিয়ে এসে

গুছিয়ে বলে, সত্যিরে টুটু, মেসোমশাইয়ের কথাটা যদি ঠিক হয়, কী ভালোই হয়!

টুটু একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, হলেই বা কী? ক'দিনের জন্যেই বা? তুই তো এ পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে যাবি।

পপি উত্তেজিত গলায় বলে, উল্টোপাল্টা কথা বলছিস যে?

দূর! তোর মতো সোজা সরল বুদ্ধি তো আর সবাইয়ের নয়? তোর মা বাবা তুই হেন মুক্তোর মালাটিকে আমার মতো একখানা বাঁদরের গলায় ঝোলাতে চাইলে তো!

দেখিস চাওয়াতে পারি কিনা।

খুব যে সাহস!

না তো কি, তোর মতন কাওয়ার্ড হব?

হুঁ! মাসিমা বোধ হয় বাড়ি নেই?

নেই তো কী? মা থাকলেই কি আমি ভয় খাই?

তার প্রমাণ একটু আগেই হয়ে গেছে।···কোথায় গেছেন মাসিমা?

বাজারে।

আহা শুনে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রে। আমার মা জননী যে কতদিন এই স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত।

সত্যি!

পপি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, পয়সা খরচ করে দুঃখু কিনেছিস তোরা?

ফের তোরা?

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, না হয় মেসোমশাই। আর আজ থেকে প্রার্থনা করি, মেসোমশাইয়ের যেন সত্যি সুমতি হয়!

টুটু একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, প্রার্থনা! হুঁঃ! ওতে যদি কোনো কাজ হ'ত এতোদিনে এ দুঃখের অবসান হ'ত।···নো

হোপ! ওই তুই যা বলেছিস, সাতমণ তেল নাচলে তবে রাধার পোড়া।

টুটু! দোহাই তোর, আর বাঙলা বলতে আসিসনে। তোর মুখে ওই ফাদার মাদারই মানায়।

* * * *

ঝামাপুকুরের সেই গলিটায় ঢুকতেই দু তিনটে আধা ছোট ছেলে খেলা ফেলে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল, কাকা! ছোটকাকা!

পীযূষ তাকিয়ে দেখল। মার্বেল খেলছিল ওরা।

গলির চেহারাটা অবিকল রয়ে গেছে, যেমন ছিল ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে।···

মনে হ'ল যেন এর মধ্যে আর দেখেনি গলিটাকে। তাই ওই ছেলেগুলোর আরো যে দলবল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে যেন হঠাৎ আর একটা হাফশার্ট আর হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলেকে দেখতে পেল। ছেলেটার তখনকার নাম ছিল 'পীযূষ'।

এখন ওই নামটা সবাই ভুলে গেছে।

হ্যাঁ ভুলেই গেছে।

তাই অসুস্থ বড়দাও কোনোমতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠেন, পীযূষ এসেছিস? পীযূষ? বাড়ির সব খবর ভালো তো?

বড়ো বৌদির অবশ্য কাঁপা গলা নয়, বলতে পারা যায়, বাজখাঁই গলা। তিনি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, ব্যাপার কী গো, কার মুখ দেখে উঠেছি আজ? ডুমুর-পুষ্পের দর্শন লাভ হ'ল।··· ওরে, কাকাকে বসতে দে।

আর বসতে দিতে হবে না—

পীযূষ দালানে পাতা আজন্ম দেখা তেল ধরা চৌকিটায় বসে

পড়ে বলে, খুব তো লজ্জা দেওয়া হচ্ছে। নিজেরাই বা একদিন যাও কই, বাবা!

ইত্যবসরে মেজ বৌদিও রঙ্গমঞ্চে এসে যান। বাড়ির সব সদস্যই জড়ো হয়ে যায়।

'ছোটকাকা' একটি দুর্লভ দৃশ্য তো।

মেজো বৌদি বলেন, আমরা? আমরা যাব?

কেন? যেতে নেই? কলকাতা শহরে যতগুলো সিনেমা হল আছে, কোথায় না দুচারবার করে পদধূলি পড়েছে! তুমি তো পাণ্ডা।

মেজোবৌদি খরখরিয়ে বলেন, সিনেমা হল ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়, তুমি তোমার বাড়ি চেনার কোনো ব্যবস্থা রেখেছ? শুনি যে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করছেন নাকি সাহেব মেমসাহেব।

আর বোলোনা। মেম সাহেব এখন খাঁটি গিন্নী।

বলে একথা পীযূষ, ইচ্ছে করেই বলে। এদের সঙ্গে এতাবৎকাল যে দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা সহজ করে নিতেই এই প্রয়াস।

বড়োবৌদি বলে ওঠেন, ছোটবৌকে তুমি খাঁটি গিন্নী বানাতে পেরেছ? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করব না।

আচ্ছা, তবে চোখেই দেখবে চল।

পীযূষ চৌকিতে একটা থাপ্পড় মারে। যেমন সেই কোন অতীতে মারত, বৌদিদির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসার বাজি ধরায়। ভারী ভালো লাগে। অদ্ভুত রকমের ভালো লাগে।···এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে পর্যন্ত যখনই এসেছে, নিজেকে কেমন অপরাধী অপরাধী লেগেছে। আজ যেন সেই অপরাধীর ভূমিকাটা থেকে বেরিয়ে পড়ে গেছে হঠাৎ।

আশ্চর্য! এরাও যেন এতোদিন আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাবে দূরত্ব রেখে কথা বলেছে, কুটুম্বর মতো ভালো মিষ্টি আনিয়ে

আপ্যায়ণ করেছে।...পীযূষ যেই দূরত্বটা দূর করতে এগিয়ে এল, এরাও সঙ্গে সঙ্গে সেটা দূর করে ফেলল।

পীযূষ বলল, সেই অভাবিত দৃশ্য দেখাবার জন্যেই আমার আসা। সামনের রবিবারে চল সবাই।

চল সবাই? কোথায়?

আহা আমার সেই পল্লী কুটিরে। সবাইকে যেতে হবে কিন্তু, কাউকে ছাড়ব না।

ভালো লাগছে। নিজের কথাই নিজের কানে মধুবর্ষণ করছে। পীযূষকান্তি নামের লোকটা তো আগে এই ভাষাতেই কথা বলত। মাঝে যেন সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। কথাতে যে এমন রস থাকে, তাই বা মনে ছিল কই?

সকাল বেলা যাবে, রাত্তিরবেলা আসবে। সারাদিনের বনভোজন!

পীযূষ কথায় আরো রস চাপায়।

পীযূষ যেন মাঝখানের বোস সাহেবকে ভুলে যায়।

উৎসুক শ্রোতাদের সমবেত প্রশ্ন উছলে ওঠে। কী হ'ল? কী বলছে পীযূষকান্তি।

ব্যাপারটা কী? হঠাৎ একি? মেয়ের পাকা দেখা নয় তো?

আরে বাবা সেদিন সুদূরে! কিচ্ছু না, এমনি—

বলে পীযূষ লজ্জা লজ্জা গলায় ব্যক্ত করে—বাড়িই কিনেছি একখানা! 'গৃহপ্রবেশের' কোনও আয়োজন তো করতে পারিনি। তাই একদিন সকলে জড়ো হয়ে হৈ হৈ করা, আর কি?

খবরটায় একটু হকচকিয়ে গেল সকলে। তারপর বড়ো বৌদি উচ্ছল হয়ে উঠলেন—এতদিন বাদে এতবড়ো খবরটা দেবার সময় পেলে ঠাকুরপো? আমরা কি.....

পীযূষকান্তি লজ্জিত গলায় বলে, না, তা ঠিক নয়, আসলে নানা ঝামেলায় ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি। নয় তো—

* * *

এরপরই পীযূষ ফুলটুসিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল।

ফুলটুসি অবাক।

রাঙাদা! হঠাৎ!

তা বলতে পারিস। সময় টময় পাই না।

তুমি তো অনেক দূরে চলে গেছ।

গিছলাম, আবার কাছে আসছি।.....তুই কিন্তু বেশ মুটিয়েছিস।

বাঃ একটু গিন্নী গিন্নী আকৃতি না হলে লোকে মানবে কেন?

ফুলটুসির বর বলে ওঠে, আকৃতিতে কি আর মানে লোকে? মানে প্রকৃতিতে। তুমি হিমালয় পাহাড় হয়ে উঠলেও কেউ মানবেনা।

ফুলটুসির ছটা ছেলে মেয়ে; বড়ো হয়ে গেছে সবাই। তাই সবাইকে নেমন্তন্ন করে পীযূষ আলাদা করে। ব্যাপার কী?

কিছু না একদিন পিকনিকের স্বাদ পাওয়া যাক।

ও বাড়ির মতো এবাড়িতেও বারবার বলল পীযূষ। আর বলল, সবাই মিলে একদিন হৈ চৈ করা যাবে। ঝামাপুকুরেও সবাইকে বলে এলাম।

ওমা তাই নাকি? কী মজা!

ছেলে মানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে ফুলটুসি। সেই আহ্লাদের অনুরণনটুকু নিয়ে পীযূষ সেই ভবিষ্যৎ উৎসবের দিনটির ছবি দেখে উল্টে পাল্টে...ট্যাক্সীতে বসে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

পীযূষ যেন একটা মস্ত ঐশ্বর্য হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

আশ্চর্য! এটা পীযূষের হাতে ছিল?

এই মস্ত ঐশ্বর্যটা?

অথচ পীযূষ কেবল পাশ কাটিয়ে পালিয়েছে। কারণ পীযূষকান্তি এযাবৎ নিজেকে পরিচালিত করছে কেবল অন্যের ইচ্ছের অঙ্গুলি হেলনে। হঠাৎ সেই পাশাটাও উল্টে ফেলতে পেরেছে পীযূষ।

গড়িয়াহাটের ধারে ছবির মতো সুন্দর একটি ফ্ল্যাট আর মাসে মাসে অনেকগুলো টাকা ওদের হাতে ধরে দিয়ে পীযূষ এবার থেকে নিজের জীবনের কর্মধার নিজে হবে।

কিন্তু বুঝতে দেবে না কাউকে।

ওরা ভাববে আমার চোখে বুঝি এখনো সেই পুরনো চশমাটাই আছে।

আজ আর দেরী হ'ল না বাড়ি ফিরতে—

সুরমা অবাক হয়ে বলল, ট্যাক্সীতে এলে? অসুখ টসুখ করেনি তো?

পীযূষ হেসে বলল, শুধু কি অসুখেই গাড়ি চড়তে হয়? সুখে চড়া যায় না?

হঠাৎ এতো সুখটা কিসের?

বলব—বলব—সবাই একসঙ্গে হও।

সুরমা আর কথা বলল না।

সুরমা ভাবল, ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কোনো পার্টি ফার্টিতে মদ টদ খেয়ে এলনা তো। এমন পার্টিতে তো হরদমই যায়, লোকটা খায় না তাই। তা মন না মতি।

সবাই একত্র হতে রাত্রি।

সবাই একত্র হলে কথাটা:ভাঙল পীযূষ। বালিগঞ্জ প্লেসে ফ্ল্যাট ঠিক করে এসেছে, সামনের মাসের পয়লা উঠে যাওয়া যাবে।

শুনে প্রথমটা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

পীযূষ যেন সহসা ওর পরিজনের ওপর একটা থাপ্পড় বসিয়েছে।

তারপর একটা অনাস্বাদিত স্বাদের ঢেউ বইতে লাগল। বিস্ময়ের, আনন্দের, আবেগের, অবিশ্বাসের।

অবিশ্বাসটাই প্রধান, বাবা হয়তো ঠাট্টা করছে। পকেট থেকে দলিলটা বার করার পর অবশ্য আর অবিশ্বাস থাকে না।

বহুদিন পরে আবার পীযূষকে ঘিরে কল-কোলাহল ওঠে। বাপী তুমি কী সুইট্, বলে গলা ধরে ঝোলেনা বটে বুলু, তবে বাপীর গা ঘেঁষে বসে, বাপীর এই সারপ্রাইজ দেওয়ার অভিনয় মহিমায় বিগলিত হয়।

সুরমা হাসি হাসি মুখে সেই ফ্ল্যাটের বর্ণনা বিবরণ শোনে আর বলে, যাক জীবনে প্রথম একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখালে তুমি। আমায় না জানিয়ে এমন একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছ।

পীযূষকান্তি বোস সুরমার অগোচরে আরো কত বৃহৎ একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে, সুরমা কি তা জানে? বলবে, পীযূষকান্তি সবই বলবে।

তবে চট করে ভাঙলনা। আস্তে আস্তে ভাঙতে বসল, আরো একটা তাক লাগাবার মতো জিনিস দেখাব তোমাদের।

নীলু হেসে ফেলে বলে, সেটা আবার কী বাপী?

সেটা? সেটা তোদের ফুলটুসি পিসি। সামনের রবিবারে আসবে, দেখিস সেই টুনি পাখির মতো মানুষটা স্রেফ ফুটবল হয়ে গেছে। একদম গোল! বলে কিনা আকৃতি দেখে কেউ গিন্নী বলে মানে না, তাই শরীরটাকে পাম্প করে ফুলিয়ে নিয়েছি। ...তা তোদের পিসেমশাই বলে, আকৃতিতে কি আর কেউ মানে হে? মানে প্রকৃতিতে। তুমি একখানি গন্ধমাদন পর্বত হয়ে উঠলেও

তোমায় কেউ মানবে না।···বেশ আছে ওরা সবাই, হেসে খুশে ঠাট্টা তামাসা নিয়ে।

সুরমা এতোক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর আলো আলো মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল, এখন ভুরু কুঁচকে বলল, ফুলটুসিদের বাড়ি কখন গেলে ?

ওইতো সন্ধেবেলা।

ওঃ আড্ডা দিয়ে দেরী করে ফেরার খেসারৎ বুঝি ট্যাক্সি ভাড়া গেল ?

না না, আজ দুপুর বেলাই অফিস থেকে কাট মেরেছি।

ওঃ। তা হঠাৎ আসবার ইচ্ছে হ'ল যে ?

আরে বাবা, ইচ্ছে তো ওর হয়েই আছে, জানতো ওকে। বরের ওপর খুব ঝঙ্কার দিচ্ছিল, নিয়ে আসে না বলে। আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে, রবিবার সকালে চলে যাবি ওখানে, পিকনিক হবে। ঝামাপুকুরের ওখানেরও সববাইকে বলে এসেছি। সবাই মিলে হৈ হৈ করা যাবে একদিন।

নীলু সকলের বড়ো, নীলুর স্মৃতিতে ঝামাপুকুরের বাড়ির ছবিটা স্পষ্ট। নীলু বলে ওঠে, ওমা, কী মজাই হবে তাহলে। উঃ কতদিন যে দেখিনি ওঁদের! মুখগুলোই ভুলে গেছি যেন।

কথাটা সত্যি।

আসা যাওয়া নেই।

প্রথম প্রথম সুরমার বড়জা পারিবারিক বার ব্রত নিয়ম লক্ষণ ষষ্ঠি মনসা ইত্যাদিতে নেমন্তন্ন করে পাঠাতেন। ক্রমশই সেটা শূন্যের অঙ্কে পর্যবসিত হয়ে গেছে। যে যাবে, তার সময় হয় না, সুবিধা হয় না, যারা ডাকবে তারাও স্তিমিত হয়ে যায়।

অতএব নীলুর পক্ষে ওটা বলা ভুল নয়।

বুলু হঠাৎ বলে ওঠে, এত সব নেমন্তন্ন করে এলে ? কী ব্যাপার বাপী ? এত খাটবে কে ? মাকে তো তাহলে বধ করা হবে।

এই দেখ, এত সব তোদের মার ঘাড়ে চাপাব? আমি কি এতই পিশাচ রে?....কথা বার্তায় নিজের ফর্মে এসেছে পীযূষ, একেবারে আমাদের ও পাড়ার কেশব ঠাকুরকে বলে এলাম, রবিবার ভোরবেলাই সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে চলে আসতে। স্রেফ দিশী রান্না। বড়দা তো আবার মাংস টাংস খাননা।...বাজারটা আমি গড়িয়াহাট থেকে —জায়গারতো অভাব নেই এখানে। ধোঁয়া টোঁয়া সব বাড়ির বাইরে হবে।

যত তাড়াতাড়ি পারে, কথাগুলো বলে নেয় পীযূষ। আরো কি বলতে যাচ্ছিল—

সুরমা সহসা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে বলে, এত সব হয়ে গেছে? এটা তো মনে হচ্ছে আরো তাক লাগবার মতো। তা ব্যাপারটা কী? হঠাৎ কোনো লটারিতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়ে গেছ নাকি?

পীযূষ মৃদু হেসে বলে, তা প্রায় তাই। এই বাড়িটাকে কাল বায়না করতে আসবে, বেশ মোটা টাকা দেবে। দামের ওপর সেটা ফাউ। তাই ভাবলাম গৃহপ্রবেশে তো কাউকে—

সুরমা আরো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, বাড়িটাকে বায়না মানে?

মানে? মানে বেশ একখানা খদ্দের ঠিক করে ফেলে বাড়িটা বেচে দিচ্ছি।

ধাক্কায় স্প্রীঙের মতো ছিটকে উঠল সুরমা, তার মানে? বাড়িটা বেচে ফেলার একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছ? খদ্দের রেডি, অথচ আমায় একবার জানানোর পর্যন্ত দরকার মনে করনি।

সুরমার এই অভিযোগের সঙ্গে সুরমার তিনটি সেনাপতিরও সমর্থন যুক্ত হয়।

সত্যি এ কী অন্যায়!

পীযূষ শান্তগলায় বলে, কিন্তু জানাইনি বলছ কেন? সেদিনতো স্পষ্ট করেই বলেছিলাম—

বাঃ সে তো একটা কথার কথা। সেটা কোনো কাজের কথা নাকি। সকলেই তো ভেবেছিল, রাধাও নাচবে না, সাতমণ তেলও পুড়বে না। এক্ষুণি যে এতবড়ো বাড়িটার খদ্দের জুটে যাবে তা কে জানে।

পীযূষ আরো শান্তগলায় বলে, তা তোমাদের এতে বিচলিত হবার কী আছে? এ বাড়িটাতো তোমাদের দু' চোখের বিষ।

বাড়িটার কথা কে বলেছে! জায়গাটা।

সে একই কথা। তোমরা তো এখানে থাকবে না, তবে এটা রেখে লাভ?

সুরমা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, একেবারে থাকব না, একথা কে জোর করে বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বলা যায়?

ভবিষ্যৎ!

পীযূষকান্তি বোস কি এখন হেসে উঠবে? হো হো করে? সুরমাও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসেছে?

না লোকের সামনে হাসা যায় না, হাসবে মনে মনে।

পীযূষকান্তি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, তা তোমার ওই 'ভবিষ্যৎটা' তুলে রাখতে হলে তো আবার সেই বর্তমানটাকেই বন্ধক দিতে হয়। সম্পত্তিটা বেচে না ফেললে তো আর—

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে সুরমা খিলখিল করে হেসে ওঠে। ছুরির ধারের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র।

কিন্তু সম্পত্তিটা কার? কার সম্পত্তি কে বেচবে? বাড়িটা সুরমা বসুর নামে তা নিশ্চয় মনে আছে? এ সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো কিছু করার অধিকার আইনত তোমার নেই, তা জান?

পীযূষ ও কথাটাকে নস্যাৎ করে দেবার ভঙ্গীতে বলে, ওটা তো কোনো কথা নয়, ইনকাম ট্যাক্সের ঝঞ্ঝাট বাঁচাতে সবাই অমন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি কেনে।

সুরমার মুখে তীক্ষ্ণ রহস্যময় একটু হাসি ফুটে ওঠে, যে জন্যেই যা

করুন, সেই স্ত্রীর সই ভিন্ন তো আর বেচাকেনা যায় না? বাড়ি বিক্রীর ব্যাপারে সই আমি দিচ্ছি না।

টুটু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জোর হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, ওঃ, জননী! কী ফার্স্টক্লাস ব্রেন! কী একখানা প্যাঁচ বাতালে মাইরি! বোস সাহেব একেবারে ঠাণ্ডা। কিন্তু এই ইটের হিমালয়খানি নিয়ে কী করবে বলতো?

সুরমা মহেন্দ্রানীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, কিছু না করি, মাঝে মাঝে সবাই মিলে পিকনিক করতেও আসতে পারে। মোট কথা—আমার সম্পত্তি আমি হাতছাড়া করতে দেব না। সাতজন্মে তো তোদের বাপী আমায় একখানা দামী গয়নাও দেয়নি, নেহাৎ ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার দরকারে সম্পত্তি আমার নামে বেনামী করা হয়েছে। আমিই বা সে সুযোগ ছাড়ব কেন? তোমার খদ্দেরকে বলে দিও—যাঁর জিনিস তিনি বেচতে রাজী নয়। ব্যস।

ব্যস!

এরপর আর কথা নেই।

আর তবে তুমি কী করবে পীযূষকান্তি বোস? মাথা চাপড়াবে? মাথার চুল ছিঁড়বে? অথবা গিন্নীর পায়ে ধরবে?

না কি গিয়ে বন্ধুর পায়ে পড়েই বলবে, ভাই হে, আমার আর কিছু করার নেই। আমি নিরুপায়।...আর সেই নিরুপায়তা আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি। অনেক পয়সা দিয়ে।...

যেমন কিনে থাকি আমাদের সব দুঃখ আর অভাব, সব জ্বালা আর যন্ত্রণা। কিনে কিনে জড়ো করে চলি সারাজীবন ধরে। আর ভাবি খুব বুদ্ধির কাজ করছি।